সেপ্টেম্বর ২০২২ ▪ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৯

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন

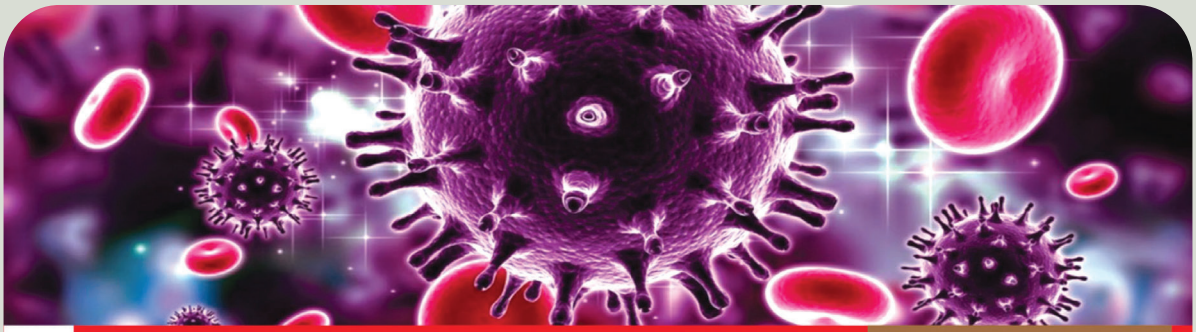

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

সেপ্টেম্বর ২০২২ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৯

সম্পাদকীয়

দূরদর্শী নেতৃত্ব, কর্তব্যে অটল, মানবিক গুণে মহিমান্বিত, জাতীয় উন্নয়নের কিংবদন্তি রূপকার, মহীয়সী নারী শেখ হাসিনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সেসময় জার্মানিতে অবস্থান করায় বেঁচে যান। পরবর্তী সময়ে ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করে। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে শেখ হাসিনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে সাময়িক সময়ের জন্য ক্ষমতার বাইরে রাখা হলেও ২০০৯ সালে জনগণের সমর্থনে আবারও দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পান। তাঁর প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ও জাতীয় উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিরলস প্রচেষ্টার কারণে জনগণ একাদিক্রমে দুই মেয়াদে তাঁকে নির্বাচিত করে। এ সময়ে বাংলাদেশ উন্নয়নের নতুন মাত্রা পায়। দারিদ্র্যহার হ্রাস, উন্নয়নের সামাজিক সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে বাংলাদেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, জাতিকে করেছেন মহিমান্বিত। ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২২ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন। তাঁর জন্মদিনকে উপলক্ষ করে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর সেপ্টেম্বর ২০২২ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস। জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (ইউএনডব্লিউটিও) উদ্যোগে ১৯৮০ সাল থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর দিবসটি পালন করা হয়। পর্যটনের ভূমিকা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিবসটি পালন করা হয়। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'Rethinking Tourism'। দিবসটি উপলক্ষে রয়েছে নিবন্ধ।

২৮শে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। জনগণের কাছে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দিবসটি পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য– 'তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক'। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ। এছাড়া গল্প, কবিতা ও অন্যান্য নিয়মিত বিষয় রয়েছে সংখ্যাটিতে। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

জনগণের তথ্য অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ৪
মরতুজা আহমদ

শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ৭
প্রফেসর ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে

পদ্মা নদীর বুকে স্বপ্নের পদ্মা সেতু ১০
ড. মোহাম্মদ আলী খান

ছিয়াত্তরে পা রাখছেন শেখ হাসিনা ১২
জাফর ওয়াজেদ

আপনিই তো বাংলাদেশ ১৪
নাসির আহমেদ

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট এবং শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার নির্বাসিত জীবন ১৭
ড. আফরোজা পারভীন

শেখ হাসিনার লেখকসত্তা: সুধীজনের অভিমত ২১
রফিকুর রশীদ

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে পদ্মা সেতু ২৪
ইয়াকুব আলী

বঙ্গবন্ধুর পর শেখ হাসিনা: নামকরণে মহানুভব ২৭
ড. মুহম্মদ মনিরুল হক

রাজনন্দিনীর মানবিক অভিযান ২৯
শাফিকুর রাহী

পদ্মা সেতু: দক্ষিণী উন্নয়নের সোনালি দরজা ৩২
জাকির হোসেন

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ ৩৪
হাছিনা আক্তার

পদ্মা সেতু শেখ হাসিনার অনন্য অর্জন ৩৬
শামসুজ্জামান শামস

আমাদের অভিভাবক হয়ে স্বপ্ন ছুঁয়েছেন ৩৮
রেজা নওফল হায়দার

রমা চৌধুরী একজনই ৩৯
রহিমা আক্তার মৌ

প্রধানমন্ত্রীর সম্মাননায় আরেকটি অর্জন ৪১
সুস্মিতা চৌধুরী

ডেঙ্গুজ্বর নিয়ন্ত্রণে সতর্কতা জরুরি ৪৩
ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

পর্যটনশিল্পে বাংলাদেশ ৪৪
ফাতেমা আক্তার

সাক্ষরতা হোক অগ্রগতির সমন্বয়ক ৪৬
প্রশান্ত দে

গল্প

আদর্শলিপি ৫০
মনি হায়দার

কবিতাগুচ্ছ ৪৮-৪৯, ৫৩-৫৪
আসলাম সানী, মোহাম্মদ ইল্ইয়াছ, গোপেশচন্দ্র সূত্রধর, নিকুঞ্জ কুমার বর্মন, দেলওয়ার বিন রশিদ শেলী সেলিনা, রীনা তালুকদার, সপ্তিকা চক্রবর্তী মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন, সুফি মোশারফ, গাজী সাইফুল ইসলাম, হাসান হাফিজ, পীযুষ কান্তি বড়ুয়া, হাসান আলীম, আবু নাসের সিদ্দিক তুহিন প্রত্যয় জসীম, আনসার আনন্দ, সোহানা আকতার

ছড়াগুচ্ছ ৫৫
পারভীন আকতার, আহসানুল হক, নাসিমা আক্তার নিঝুম, অপু বড়ুয়া, মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৫৬
প্রধানমন্ত্রী ৫৭
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫৭
শিক্ষা ৫৮
উন্নয়ন ৫৯
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৯
অর্থনীতি ৬০
নারী ৬১
সামাজিক নিরাপত্তা ৬১
কৃষি ৬২
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬২
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৬২
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬৩
ক্রীড়া ৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
চলে গেলেন কিংবদন্তি
গাজী মাজহারুল আনোয়ার ৬৪

হাইলাইটস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন

২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন। তদানীন্তন গোপালগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণে পাটগাতী ইউনিয়নের ঘাঘর ও মধুমতী নদীবিধৌত এলাকার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা দম্পতির ঘরে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মতো দেশকে ভালোবাসেন। তাঁর স্বপ্ন দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বজন হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে সফলতার উচ্চতায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন নিরন্তর। তিনি ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলকে সুসংগঠিত করেন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে। শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ উন্নয়নের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের গৌরব অর্জন করেছে। বাংলাদেশ 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। দৃঢ়চেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ প্রমত্তা পদ্মার বুকে বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধন করেন। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের সক্ষমতা, আত্মমর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক। তিনি উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় অসংখ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, অর্জন করেছেন সম্মান ও মানুষের ভালোবাসা। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সফল রাষ্ট্রনায়ক, সুলেখক, সংস্কৃতিমান ও উন্নয়ন-অগ্রগতির আলোকবর্তিকা। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখা হয়েছে– নিবন্ধ, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া ও গান। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে 'শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন', 'পদ্মা নদীর বুকে স্বপ্নের পদ্মা সেতু', 'ছিয়াত্তরে পা রাখলেন শেখ হাসিনা', 'আপনিই তো বাংলাদেশ', '১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট এবং শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার নির্বাসিত জীবন', 'শেখ হাসিনার লেখকসত্তা : সুধীজনের অভিমত', 'আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে পদ্মা সেতু', 'বঙ্গবন্ধুর পর শেখ হাসিনা: নামকরণে মহানুভব', 'রাজনন্দিনীর মানবিক অভিযান', 'পদ্মা সেতু: দক্ষিণী উন্নয়নের সোনালি দরজা', 'নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ', 'পদ্মা সেতু শেখ হাসিনার অনন্য অর্জন', 'আমাদের অভিভাবক হয়ে স্বপ্ন ছুঁয়েছেন', 'শেখ হাসিনার সম্মাননায় আরেকটি অর্জন' শীর্ষক প্রবন্ধ/নিবন্ধ পড়ুন।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

জনগণের তথ্য অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

মরতুজা আহমদ

২৮শে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও তথ্যে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দেশব্যাপী দিবসটি পালিত হয়। জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় গৃহীত হয় নানা কর্মসূচি। মানুষের এই তথ্য অধিকারের রয়েছে এক ইতিহাস।

পৃথিবীতে তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এর পেছনে অনেক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রয়েছে। তবে তথ্য জানার ধারণাটি মানব সভ্যতার উষাকাল থেকেই পৃথিবীতে বিরাজমান। প্রাচীনকালে বনে-জঙ্গলে খাবারের জন্য কোনো বন্যপ্রাণী পাওয়া গেলে এক দল তা অন্য দলকে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দিত। একজন উলঙ্গ মানুষ যখন গাছের ছাল বা পশুর চামড়া দিয়ে শরীর ঢাকতে শুরু করল তখন তারা অন্য দল বা গোষ্ঠীকে জানায় শরীর ঢাকার পদ্ধতি। আগুনের ব্যবহার শুরু হয় পরস্পরের সহযোগিতায়। এভাবে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

আবার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনগণকে তথ্য প্রকাশের ব্যাকুলতার ইতিহাসও প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০-৭০ সময়ে জুলিয়াস সিজার চালু করেন প্রাত্যহিক আইন (Actadium), জনসাধারণ আইন (Actapopul), মিউনিসিপাল আইন (Actaurban), সরকারি আইন (Acta Publica)। এই আইনগুলো রোমের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে রাখা হতো। ফলে মানুষ সহজেই সরকারি তথ্য পেত। খ্রিষ্টপূর্ব ১১-১৪ সময়ে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে Town Criers নামে একদল লোক চিৎকার করে প্রতিদিনের খবর মানুষকে শোনাতো। প্রশাসনিক কাজ যাতে নির্ভুল হয় এবং জনগণকে যাতে নির্ভুলভাবে তথ্য দেওয়া যায়, তার জন্য ৪৪৯ খ্রি. রোমের Ceres মানমন্দিরের সিনেটে প্রথম অফিসিয়াল রেকর্ড সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এটা ছিল তথ্য জানার অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক পর্ব।

সাধারণ মানুষের অধিকার বঞ্চনার ইতিহাসের মতোই তথ্য বঞ্চনার পুরনো ইতিহাস রয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের যে পর্যায়ে সমাজে শ্রেণি বিভাজন হয়েছে সে পর্যায়ে ক্ষমতাবানরা সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রাখার প্রয়াস নিয়েছে। তাদের বিত্তবৈভব, সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষমতাকে নিরাপদ রেখেছে। আবার সভ্যতার ক্রমবিকাশের যে পর্যায়ে গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছে তখন থেকেই জনগণের তথ্য জানার অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় এসেছে। তাই গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে Press freedom ও তথ্য অধিকারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পঞ্চদশ শতকে যান্ত্রিক প্রেস আবিষ্কারের সাথে সাথে যেন বিপ্লব ঘটল। পুস্তক, সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনার বিস্তার ঘটতে থাকল। ছাপানো পুস্তক হাতে হাতে চলে গেল। ফলে বিভিন্ন ধারণা, চিন্তা, ভাব, বিশ্বাস ও অনুভূতিরও দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকল। ক্ষমতাবান কোনো কোনো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এগুলোকে সত্যিকার Challenge মনে করে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বিবেচনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশনায় হস্তক্ষেপ শুরু করল।

তৎকালীন ব্রিটিশ একটি আইনে শর্ত দেওয়া হলো, কোনো বই প্রকাশের জন্য সরকারের পূর্ব অনুমতি নিতে হবে। আন্দোলন শুরু হলো। তথ্য অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ১৬৪৪ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ কবি ও বুদ্ধিজীবী John Milton তাঁর *Areopagetica*-তে যুক্তি দিলেন, 'Truth and understanding are not such wares as to be monopolized and traded in by tickets and statutes and standards.' একই বইতে তাঁর কালজয়ী উক্তি : 'Give me the liberty to know, to utter and to argue freely according to conscience, above all liberties.' এভাবে ইউরোপজুড়েই তথ্য ও প্রেসের স্বাধীনতার আন্দোলন চলতে থাকল।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বে ফিনল্যান্ডের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও ফিনিসীয় যাজক Anders Chydenius সেখানকার কোক্কেলা শহর থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিয়ে রীতিমতো আন্দোলন শুরু করে দেন। তিনি বলেন, মানুষ তার প্রয়োজনে যা চায় তা কীভাবে, কোথায়, কোন অবস্থায় আছে তা তাকে জানাতে হবে। তার চাহিদা সে কতটুকু পূরণ করতে পারবে তাও মানুষকে জানাতে হবে। তাই বলা হয়, ফিনল্যান্ডই তথ্য অধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার। তবে ফিনল্যান্ড তখন সুইডেনের আওতাভুক্ত ছিল। Anders Chydenius সুইডেনের সংসদে বিল উপস্থাপন করেন। পাস হয় সুইডেনের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন ১৭৬৬ সালে। এ আইনের মাধ্যমে সুইডিশ জনগণকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট অথবা প্রাপ্ত দলিল-দস্তাবেজ পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। সরকার, সংসদ, চার্চ, স্থানীয় সরকারের আইন, আইনসভা সবকিছুই এর আওতাধীন। বিনামূল্যে এবং দ্রুত তথ্য দিতে সরকারকে বাধ্য করা হয়। নাগরিকের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এটাই বিশ্বের প্রথম আইন।

তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ফরাসি বিপ্লবের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তথ্য জানার অধিকারকে প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ফ্রান্স ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবে। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম অর্জন ছিল Liberty।

'সরকারি করের প্রয়োজনীয়তা, করমুক্ত রাখার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান, আদায়কৃত করের ব্যবহার এবং এটির অংশ, উৎস বা ভিত্তি, সংগ্রহ এবং ব্যাপ্তিকাল ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে সকল নাগরিকের নিজের কিংবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে জানার অধিকার রয়েছে।' 'একজন সরকারি কর্মকর্তার কাছে তার প্রশাসন সংক্রান্ত হিসাব চাওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে।' *(Articles 14 & 15, Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 26 August, 1789)*। তবে ফ্রান্সে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয় ১৯৭৮ সালে।

অন্যদিকে U.S সংবিধান প্রণেতারা ১৫ই ডিসেম্বর ১৭৯১ সালে U.S Bill of Rights-এর First Amendment করে Press Freedom-এর স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেন, যেখানে বলা হয় 'Congress shall make no law...abridging the freedom of speech or the press.'

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলো। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে রেজুলেশনের মাধ্যমে তথ্য অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হলো, 'Freedom of information is a fundamental right and is the touchstone of all the freedom to which United Nations is consecrated.' পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (UDHR) জারি হয়। ঘোষণাপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদে তথ্যের স্বাধীনতাকে সার্বজনীন মানবাধিকার হিসেবে সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এটি অন্যতম ঘটনা। এরপর ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে গৃহীত জাতিসংঘের 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি'র (ICCPR) অন্তর্ভুক্ত করে তথ্য অধিকারকে আরও সুসংহত করা হয়। এছাড়া কমনওয়েলথ তথ্যে স্বাধীনতার নীতিমালা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার কনভেনশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিভিন্ন দেশে দেশে তথ্যের স্বাধীনতা বা তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়– যার সংখ্যা এ পর্যন্ত ১২৯টি।

তারও অনেক পর ২০০২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে বিশ্বব্যাপী মানুষের তথ্য অধিকার আন্দোলনে সম্পৃক্ত সকল সংগঠন একত্রিত হয়ে FOI (Freedom of Information) Network গঠন করে। নেটওয়ার্কের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেয়, বিশ্বের সকল দেশ ২৮শে সেপ্টেম্বর নিজ নিজ পরিমণ্ডলে তথ্য অধিকার বিষয়ে নিজস্ব ধ্যানধারণা ও সাফল্যগাথা প্রচার করবে যাতে সকল মানুষের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়, স্ব স্ব দেশে প্রয়োজনীয় আইন, নীতিমালা, কাঠামো তৈরি হয় এবং এজন্য বাস্তবিক অর্থে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে ২০১৫ সালের ১৬ই নভেম্বর ইউনেসকো তার ৩৮ সি/৫৭ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবছর ২৮শে সেপ্টেম্বর 'International Day for Universal Access to Information (IDUAI)' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। সে থেকেই এদিনে বিশ্বের দেশে দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটি পালিত হচ্ছে।

পুরো ইউরোপ ও আমেরিকাজুড়ে যখন মানুষের তথ্যে অভিগম্যতা ও তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তখন পাকিস্তান-ভারত উপমহাদেশ ব্রিটিশের উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯৫৭-তে পলাশীর প্রান্তরে যখন স্বাধীনতা অস্তমিত হচ্ছিল, জনগণ তখন ঘরে বসে হাততালি দিয়ে বলাবলি করছিল, 'রাজায় রাজায় লেগেছে যুদ্ধ, দেখি কে হারে কে জেতে'। তথ্য জানার স্বাধীনতা দূরের কথা, পরাধীনতার ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত হচ্ছিল এতদাঞ্চল। শাসকরা ঢোল পিটিয়ে দয়া পরবশে যেটুকু তথ্য জনগণকে দিত সেটুকুই তার পাওনা বলে সাধারণ মানুষের সন্তুষ্টি ছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে জাগ্রত করে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেন। জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সংবিধানে মানুষের সকল মৌলিক অধিকারের সাথে ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার তথা তথ্য অধিকারকে নাগরিকের অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবেই তিনি প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ অর্থাৎ বিশ্বসভার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটান। সংবিধানের সে শক্তিতে ভর করে মানবাধিকার কর্মী, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, একাডেমিসিয়ান, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তথ্য অধিকার বিষয়ে আইনের খসড়া তৈরি হয়। ২০০৮ সালে অধ্যাদেশ হয়। ২০০৮ সালেই জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনি মেনিফেস্টোতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার করে। ২০০৯-এর ২৯শে মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস করে, গেজেট প্রকাশ ও কার্যকর করে এবং কমিশন গঠন করে। সে থেকে বাংলাদেশে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আইনি স্বীকৃতি পায়। এ আইনের ৪ ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে– 'এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।'

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ একটি আধুনিক, অনন্য ও

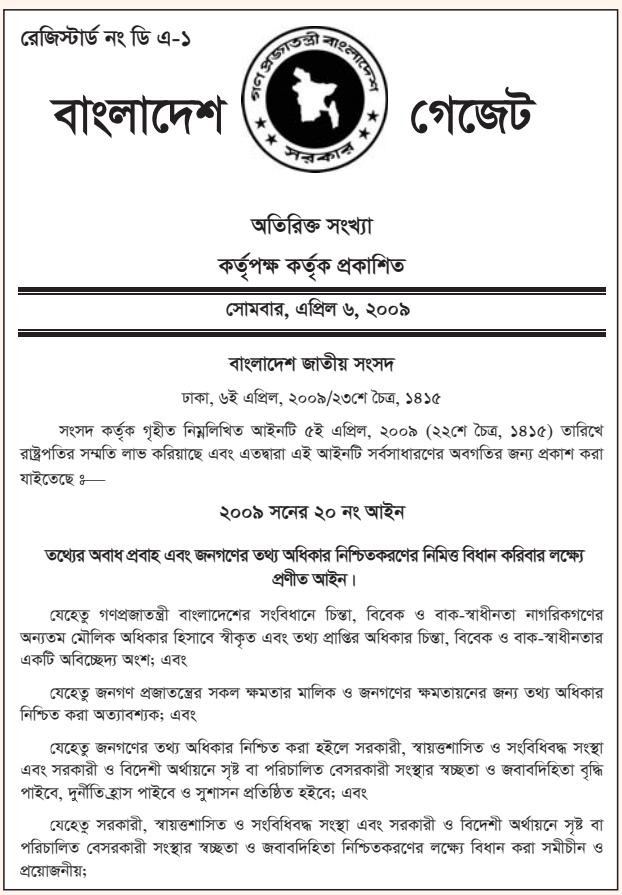

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই এপ্রিল, ২০০৯/২৩শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই এপ্রিল, ২০০৯ (২২শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ২০ নং আইন

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং

যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং

যেহেতু সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

প্রাগ্রসর আইন। এই আইনের মাধ্যমে বিরাজমান বিভিন্ন নীতি-আদর্শ ও চেতনায় Paradigm Shift হয়েছে। এই আইনে জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে; কর্তৃপক্ষের কাজের, সেবার ও বাজেটের হিসাব চায়; অন্যান্য আইনে কর্তৃপক্ষ জনগণের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এই আইনের মূল দর্শন হলো– 'Disclosure is rule, secrecy is exception'. অন্যদিকে দীর্ঘ প্রচলিত 'Official Secrets Act'-এর দর্শন 'Secrecy is rule, disclosure is exception'। আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য– আমাদের দেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা শতাব্দী প্রাচীন। সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ মতে, উভয় বিচারের ক্ষেত্রে যিনি আদালতে বিচার প্রার্থী, Burden of proof তারই। ফৌজদারি ব্যবস্থায় যতক্ষণ আদালতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ আসামি নির্দোষ বলে গণ্য হবেন। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন মতে এটি Quasi-Judicial Court. কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চেয়ে সংক্ষুব্ধ কোনো নাগরিক তথ্য কমিশনে অভিযোগ করলে কমিশন কর্তৃপক্ষ বা তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন, এই আদালতে Burden of proof কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার, আবেদনকারী বা অভিযোগকারীর নহে। অন্য কথায় বিচার প্রার্থীর নহে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকেই বা কর্তৃপক্ষকে, না পারলে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের আদেশ বা বিভাগীয় মামলার সুপারিশ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হতে পারে।

আমাদের তথ্য অধিকার আইনটি নিঃসন্দেহে সার্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকার অন্যান্য সকল মৌলিক মানবাধিকার পূরণে পরশপাথর। আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত, পঙ্গু/বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ, বিধবা, বৃদ্ধ, চরম দারিদ্র্যপীড়িত, ভাসমান, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও মহিলা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, নিরক্ষর– তাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার।

২০২২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত হচ্ছে। 'তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক'– এবারের এ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন ও পৌর ডিজিটাল সেন্টারসহ ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং এ সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধি প্রত্যেকটিই তথ্যপ্রযুক্তিবান্ধব। তথ্যের অবাধ প্রবাহ তথা তথ্য সহজলভ্যকরণ, তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রচার ও প্রকাশ, তথ্য আদান-প্রদান– সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তি ও প্রদানে ইমেইলের ব্যবহার, সকল কর্তৃপক্ষের ইন্টারনেট সংযোগ সার্বক্ষণিক সচল রাখা, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস ও সংরক্ষণ, তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন, অন্যান্য দপ্তর-সংস্থা ও জনগণের সঙ্গে যোগসূত্রের মাধ্যম, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রদান ও প্রকাশের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ওয়েবসাইটের আবশ্যিক ব্যবহার ও হালনাগাদকরণ, তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান রয়েছে। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ওয়েবসাইটের সর্বোত্তম ব্যবহার স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে যা সুশাসনের অন্যতম অনুষঙ্গ।

তথ্য কমিশন অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় তথ্য আদান-প্রদানে সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও চর্চা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অনলাইনে অভিযোগ শুনানি ও নিষ্পত্তিকরণ, তথ্যের আবেদন গ্রহণ ও প্রদান, অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রচলন করা হয়েছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ঘোষণার আওতায় ইতোমধ্যেই তৃণমূল পর্যন্ত শক্তিশালী ও সমন্বিত ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক, নিজস্ব স্যাটেলাইট ও শক্তিশালী মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন, ৫৮৬৫টি ইউনিয়ন ও পৌর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন, প্রায় ৫০ হাজার ওয়েবসাইট সংবলিত সর্ববৃহৎ ওয়েবপোর্টাল তৈরি, বিভিন্ন কলসেন্টার স্থাপন ইত্যাদি কারণে প্রান্তিক জনগণেরও ঘরে বসেই প্রয়োজনীয় তথ্য ও তথ্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে বিদ্যমান প্রতিকূলতা দূর করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হবে– এটাই এ দিবস পালনে দেশবাসীর প্রত্যাশা।

মরতুজা আহমদ: প্রধান তথ্য কমিশনার

শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী ৫ই আগস্ট। ১৯৪৯ সালের এই দিনে তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শহিদ শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ৫ই আগস্ট তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ১০ টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাকটিকিট ও ১০ টাকা মূল্যমানের উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত করেন এবং পাঁচ টাকা মূল্যমানের ডাটা কার্ড ও বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের বড়ো ছেলে শেখ কামাল বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ছাত্রলীগের একজন নিবেদিত, সংগ্রামী ও আদর্শবাদী কর্মী হিসেবে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ার কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কর্মসূচির পাশাপাশি সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণে মঞ্চ নাটক আন্দোলনের ক্ষেত্রে শেখ কামাল ছিলেন প্রথম সারির সংগঠক। তিনি আরও বলেন, শেখ কামাল বন্ধু শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'স্পন্দন' শিল্পীগোষ্ঠী। এছাড়া ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সাত রং নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য, আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ কামাল। স্বাধীনতার পর শেখ কামাল সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি নিয়ে পুনরায় লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শাহাদত বরণের সময় তিনি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের এমএ শেষ পর্বের পরীক্ষার্থী ছিলেন।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন

প্রফেসর ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ যেমন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। কারণ এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যাঁর নেতৃত্বে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর এমন একজন মহীয়সী নারীর জন্ম হয়েছিল যাঁর নেতৃত্বে দিগ্‌ভ্রান্ত আওয়ামী লীগ এক দিকে যেমন শক্ত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মদিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

১৯৭৫-পরবর্তী প্রায় সকল সরকার আওয়ামী লীগকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু এবং এই দলের অবদানকে মুছে ফেলার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। আশির দশকের শুরুতে যখন আওয়ামী লীগ বিধ্বস্তপ্রায় এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হওয়ার মতো অবস্থায়, ঠিক সেই সময় ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধু তনয়া বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদেশ থেকে দেশে ফিরে ভঙ্গুর আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পরে দলকে যেমন তিনি শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন, ঠিক তেমনিভাবে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। সেই আন্দোলনের ফসল হিসেবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৯০ সালে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে।

অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা বেশ কিছু দৃষ্টান্তমূলক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন সেই সময়। দেশের অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। যখন দেশ শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে পুনরায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে দেশের অর্থনীতিকেই শুধু অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়নি, সামাজিক ও অন্যান্য সূচকেও ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসার পর থেকে তাঁর পিতার 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। তিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক পথে এগিয়ে চলেছেন। তবে তাঁর এই যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক ছিল না। তাঁকে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠী বহুবার তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছে। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের নৃশংস ঘটনার কথা আমরা আজও ভুলতে পারিনি। সেদিন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য জনসভায় গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল। শেখ হাসিনা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও আওয়ামী লীগের নিবেদিতপ্রাণ বেশ কিছু নেতা-নেত্রী সেদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কয়েকশো নেতা-নেত্রী স্প্লিন্টারের অসহ্য বেদনা নিয়ে আজও বেঁচে আছেন। ঘাতকেরা বিভিন্নভাবে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করলেও স্রষ্টার আশীর্বাদে তিনি সকল বাধাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছেন বাংলাদেশ গড়ার কাজে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বের যে বিষয়টি আমাকে সবসময় আকৃষ্ট করে সেটি হলো তাঁর দূরদর্শিতা। নেতা হিসেবে সফল হতে হলে একজন নেতাকে জনগণের ভাষা বুঝতে হয়। বুঝতে হয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। যে কাজটি শেখ হাসিনা খুব ভালো করতে পারেন। তাঁর নেতৃত্বের দূরদর্শিতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যখন পদ্মা সেতু থেকে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় ঠিক সেই সময়। পদ্মা সেতুতে কল্পিত দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্বব্যাংকের

কর্ণফুলী টানেল

মেট্রোরেল

অর্থায়ন বন্ধের সিদ্ধান্তের ফলে দেশের বেশির ভাগ জনগণ স্বপ্নেও ভাবেনি যে বাংলাদেশে পদ্মা সেতু নির্মিত হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সবসময় তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি পদ্মা সেতু প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের কল্পিত দুর্নীতির অভিযোগের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি এটি বাস্তবে করে দেখিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, আমরা বাংলাদেশিরা যদি চেষ্টা করি তাহলে দেশের কল্যাণের জন্য অনেক কিছুই করতে পারি।

২০১২ সালের বাস্তবতায় পদ্মা সেতুর মতো একটি মেগা প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে তৈরির সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল। আমাদের দেশের অর্থনীতি গত প্রায় সাড়ে ১৩ বছরে একটি শক্ত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু এত বড়ো একটি মেগা প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি করা অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল একথাও ঠিক। এই বিষয়টি অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন সময় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয় সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে। সরকার পদ্মা সেতুর কাজ শুরু করে সমাপ্ত করেছে। একসময় যারা পদ্মা সেতু নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত তাদের সামনে আজকে পদ্মা সেতু একেবারেই দৃশ্যমান একটি স্থাপনা। ২৫শে জুন পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর পরের দিন জনগণের ব্যবহারের জন্য এটি উন্মুক্ত করা হয়েছে, সকল জল্পনা-কল্পনা অবসান ঘটিয়ে পদ্মা সেতু বাংলাদেশের একটি বাস্তবতা।

খরস্রোতা পদ্মার বুকে এই সেতু দেশের অর্থনীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে যা বলার অপেক্ষা রাখে না। মূল বিষয়টি হচ্ছে দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলার সাথে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগের একটি নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে পদ্মা সেতুর মাধ্যমে। আমরা জানি যে, দক্ষিণ বঙ্গ থেকে লবণাক্ত পানির মাছ বাংলাদেশসহ দেশের বাইরে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে মাছ চাষিদের জন্য মাছ পরিবহণ ব্যয়বহুল ছিল। এই সেতু ব্যবহার করে মাছ ও অন্যান্য পণ্য খুব অল্পসময়ের মধ্যেই ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে পৌঁছানো সম্ভব হবে। তাছাড়া এই অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের সময় অনেক কমে যাবে। এমনকি পদ্মা সেতু ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসহ অন্যান্য দেশের সাথে আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ইতিবাচক প্রভাব অর্থনীতিতে থাকবে সেটি নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আরেকটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পদ্মা সেতু ও সংযোগ সড়ক এশিয়ান হাইওয়ে রুট এএইচ-১-এর অংশ হওয়ায় তা যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। ভারত, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে সুবিধা হবে। চলাচল সহজ করার পাশাপাশি অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে পদ্মা সেতু। এ সেতু দেশের ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতিতে বড়ো ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। এছাড়া দেশের সার্বিক জিডিপির পাশাপাশি পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হলে অতিরিক্ত ১.২৩ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বাড়বে ২ দশমিক ৩ শতাংশ।

২০০৮ সালে ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কাজ সম্পাদন করেছেন। সাথে সাথে তিনি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত আসামিদের বিচার কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং বিচারের রায় কার্যকর করেছেন। এই ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের মানসিক শক্তি প্রয়োজন তা সকল নেতার মধ্যে থাকে না। আমরা বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনেক নেতার শাসন প্রত্যক্ষ করেছি। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পূর্বে নেতৃত্বের মাধ্যমে নিজেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অগ্রনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সাড়ে তিন বছর সময়ের ক্ষমতাকালে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন সেই পরিকল্পনাগুলো

ভাঙ্গা গোল চত্বর

প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন শুরু করেছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে শেখ হাসিনা তাঁর পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন এবং বাস্তবায়ন করে চলেছেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছে।

তাঁর নেতৃত্বের দৃঢ়তার কারণে বাংলাদেশ শতাব্দীর সর্বকালের সবচেয়ে খারাপ সময়েও বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। আমরা জানি গত দুই বছর সময়ের উপরে পৃথিবীব্যাপী কোভিড-১৯ ভাইরাসের তাণ্ডবে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য খাতসহ প্রায় সকল খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা সকলেই জানি নেতা হিসেবে সফল হতে হলে একজন নেতাকে সংকটকালীন সময়ে সংকটের প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে অনেক আগে থেকেই যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বের দৃঢ়তার কারণে অনেক আগেই তিনি অতিমারির বিপর্যয়মূলক প্রভাব সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন এবং এ বিপর্যয় থেকে নাগরিকদের রক্ষা করতে এবং অর্থনীতির গতিপথ চলমান রাখতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি একদিকে যেমন লকডাউন কার্যকর করেছেন, অন্যদিকে সঠিক সময়ে অফিস-আদালত-কলকারখানা এবং ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিয়ে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার চেষ্টা করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, এখন পর্যন্ত তিনি নাগরিকদের জীবন ও জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করে কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সফলকাম হয়েছেন।

আমরা সকলেই জানি, শতাব্দীর সবচেয়ে খারাপ সময়ে বাংলাদেশের মতো অর্থনীতির ক্ষেত্রে জীবন ও জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করে লকডাউন বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ খেটে খাওয়া মানুষ। একদিন কাজ না করতে পারলে পরবর্তী দিন কীভাবে সংসার চলবে সে চিন্তায় তারা ব্যস্ত থাকে। তারপরেও সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে যতটা সম্ভব দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের জন্য। এমনকি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য এক লক্ষ কোটি টাকার উপরে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ বাস্তবায়ন করেছে।

তিনি সঠিক সময়ে বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভ্যাকসিনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিলেন বিধায় ভ্যাকসিন ক্রয়ের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হওয়ার পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যখন ভ্যাকসিন সংগ্রহের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে বাংলাদেশে ভ্যাকসিন প্রদানের কার্যক্রম বেশ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলে। ভ্যাকসিন প্রদানের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক ভালো। দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশের উপর জনগণ ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে বিধায় দেশের করোনায় মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বের অন্য যে বিষয়টি আমাকে আকৃষ্ট করে সেটি হলো তাঁর সততা। আমরা গত ৫০ বছরে দেশে বিভিন্ন সরকারের শাসন প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা আরও প্রত্যক্ষ করেছি সরকারপ্রধান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অর্থ উপার্জনের জন্য দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা। দেশের সর্বোচ্চ পদে থেকে যদি কেউ দুর্নীতিবাজ হয়ে পড়েন তা দেখে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হয়। তবে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এমনকি শেখ হাসিনা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীরাও দাবি করতে সক্ষম হবে না যে তিনি বা তাঁর নিকটতম পরিবারের সদস্যরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন।

ব্যক্তি ও নেতা শেখ হাসিনার নেতৃত্বের তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্য আমাকে আকৃষ্ট করে তাহলো– মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাঁর রয়েছে বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ। বঙ্গবন্ধু যেমন তাঁর জীবদ্দশায় বাংলাদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে শেখ হাসিনা বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আর এই কারণেই বাংলাদেশের জনগণ শেখ হাসিনাকে তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছে।

কাঁচপুর ব্রিজ

পরিশেষে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনা নিজেকে এমন একটি উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, যাঁর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়। তিনি সবসময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দৃঢ় থেকেছেন। তিনি জানেন দেশ পরিচালনার জন্য কোনটি ভালো আর কোনটি খারাপ সিদ্ধান্ত। তিনি সবার কথা শোনেন, তবে সিদ্ধান্ত নেন নিজের মতো করে যা একজন প্রকৃত নেতার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য একজন নেতাকে অন্য নেতাদের থেকে আলাদা করে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস ও দূরদর্শিতা তাঁকে অন্যান্য সমসাময়িক নেতা-নেত্রীদের থেকে আলাদা করে তুলেছে। তাঁর জন্মদিনে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে তিনি যেন সুস্থ থাকেন এবং যে ধারায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সে ধারা অব্যাহত থাকুক। আমরা চাই তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রধানমন্ত্রী আপনি বাঙালি জাতির শেষ ভরসার স্থল। আপনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। শুভ জন্মদিন।

প্রফেসর ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক, pranabpanday@yahoo.com

পদ্মা নদীর বুকে স্বপ্নের পদ্মা সেতু

ড. মোহাম্মদ আলী খান

বলা হয়ে থাকে, মিশর যেমন নীল নদের দান, ফরিদপুর তেমনি পদ্মা নদীর দান। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত এল.এস.এস ও ম্যালী *ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ারে* লিখেছিলেন, 'Just as Egypt has been called the gift of the Nile, so Faridpur may be styled the gift of the Ganges (Padma) and its distributaries' (page-2)। শুধু বৃহত্তর ফরিদপুর নয়, দক্ষিণ বাংলার সব জেলার ভূমি গঠনে পদ্মার অবদান অসামান্য। আর শুধু দুই পাড়ের মানুষ নয়, পদ্মার দক্ষিণের ২১টি জেলার মানুষের সঙ্গে পদ্মার যোগাযোগ সুনিবিড়।

পদ্মা প্রমত্তা নদী। একূল ভাঙে, ওকূল গড়ে। পদ্মা বিগত কয়েক শতাব্দীতে বহুবার তার চলার পথ পালটিয়েছে। এক সময়ের দক্ষিণ বিক্রমপুর পদ্মার গতিপথ পরিবর্তনের কারণে বৃহত্তর ফরিদপুরের অংশ হয়ে বর্তমানে শরীয়তপুর জেলা। যদি প্রশ্ন করা হয়, পদ্মা তুমি কোথা থেকে এসেছ? এর উত্তর পাওয়ার জন্য যেতে হবে হিমালয়ের কাছে। জন্ম গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে ৭,০০০ মিটার উঁচুতে। নাম তার গঙ্গা। বাংলাদেশে প্রবেশের পর এর নাম হয়েছে পদ্মা। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে (১৭৮০ খ্রি.) একে গঙ্গাই বলা হয়েছে।

ভূগোলের সংজ্ঞা অনুযায়ী এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে গঙ্গা যেখানে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, অর্থাৎ গোয়ালন্দে/আরিচায়, তখন থেকে এর পরিচিতি পদ্মা এবং মেঘনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রমত্তা পদ্মা। খরস্রোতা পদ্মার ভাঙা-গড়ার খেলায় আর এক নাম হয়েছে কীর্তিনাশা। কবি নবীনচন্দ্র সেন 'কীর্তিনাশা' কবিতায় লিখেন, 'এত অভিমান যদি, ধর তবে নদী/ ধর একবার সেই ভীষণ আকার...'। ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বরে কবিগুরু রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'বর্ষার সময় সে (পদ্মা) আপনার সহস্র ফণা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে, গর্জন করতে করতে, কেমন করে আপনার প্রকাণ্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে, ফুলতে ফুলতে চলত, সেই দৃশ্যটাও মনে পড়ল...'। কত কবিতা, গানে, উপন্যাসে, গল্পে পদ্মা এসেছে তার মহিমা নিয়ে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'পদ্মার ঢেউরে– মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যারে ...'। কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঘন উচ্চারণ ছিল, 'হে পদ্মা! প্রলয়ংকরী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী...'। কবি ফররুখের কথামালায়, 'হে পদ্মা, প্রমত্ত নদী, হিমাদ্রির দুরন্ত সন্তান...'। সেই গান এখনো কানে বাজে আব্দুল লতিফের কথায়, আব্দুল আলীমের কণ্ঠে, 'সর্বনাশা পদ্মা নদী তোর কাছে শুধাই, বল আমারে...'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস *পদ্মা নদীর মাঝি*, কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের উপন্যাস *পদ্মার পলিদ্বীপ* তো প্রমত্তা পদ্মাকে ঘিরে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের ফারাক্কা

থেকে দৌলতদিয়া পর্যন্ত পদ্মার দৈর্ঘ্য ১৮৫ কিলোমিটার আর দৌলতদিয়া থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত ১০২ কিলোমিটার। সেই প্রমত্তা নদীতে ঢেউ ঠেলে বৈঠা বেয়ে বা সাঁতার কেটে নয়, এবারে তাকে বশে এনেছে স্বপ্নের সেতু, নাম তার 'পদ্মা সেতু'। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সেতু যার দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার (২০,২০০ ফুট) এবং প্রস্থ ১৮.১০ মিটার (৫৯.৪ ফুট)। ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক ২৩.৪৪৬০° উত্তর ও ৯০.২৬২৩° পূর্ব। এর সঙ্গে অ্যাপ্রোচ রোড ১২.১১৭ কিলোমিটার, নদীশাসনে গিয়েছে ১৪ কিলোমিটার, যার মধ্যে ১.৬ কিলোমিটার মাওয়ায় এবং ১২৪ কিলোমিটার জাজিরায়। জমি অধিগ্রহণে লেগেছে প্রায় ১,৪৭৪ হেক্টর। এই সেতুর অনন্য বৈশিষ্ট্য এখানে আছে রেললাইন আর দোতলায় চার লেনের সড়ক পথ। বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ পদ্মা সেতু দৃশ্যমান। বাংলাদেশের স্বপ্নকে বারে বারে গুড়িয়ে দিতে চেয়েছে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, সঙ্গে ছিল দেশীয় ষড়যন্ত্র। কিন্তু তা সফল হয়নি।

শুরুটা ভালোই ছিল, সম্ভাব্যতা যাচাই হয়েছে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনেই। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সম্ভাব্যতা যাচাই হয় ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে, পরবর্তী সময়ে জাইকার সহায়তায় ২০০৩-২০০৫ সালে। AECOM-এর নকশায় পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরুর কথা ছিল ২০১১ সালে, কিন্তু বিশ্বব্যাংক মিথ্যা অভিযোগ এনে সরে দাঁড়ায়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ঘুরে দাঁড়ায়। নিজস্ব অর্থায়নে শুরু করে নির্মাণকাজ। নির্মাণকাজ শুরু হয় নভেম্বর ২০১৪ সালে এবং শেষ অবধি একদিনের জন্যও এমনকি করোনাকালে কাজ থেমে থাকেনি। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কাজ পায় চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। সার্বিক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও সেতু বিভাগ। বাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফসল আজকের পদ্মা সেতু, যার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার ১৯৩ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা বা ৩.৮৬৮ মিলিয়ন ডলার।

এত চ্যালেঞ্জ নিয়ে আর কোনো সেতু হয়নি। আমাজন নদীর পরই পদ্মা সবচেয়ে খরস্রোতা। নদীর তলদেশে মাটির ১২২ মিটার গভীরে বসেছে পদ্মা সেতুর পাইল যা ৪০ তলা ভবনের সমান। সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে একে একে বসেছে ৪২টি পিলার। ব্যবহৃত হয়েছে ৩,৯৭,১৬৮ টন লোহা বা স্টিল প্লেট, ১ কোটি ২০ লাখ ৯৭ হাজার ৯১৪টি ইট, ৩২ লাখ ৩৭ হাজার ১৩০ ঘনমিটার পাথর, ৬ লাখ ৮৫ হাজার ৮১৯ টন সিমেন্ট, ৮০ লাখ কংক্রিট ব্লক। ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো হ্যামার। পুনর্বাসনে ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। নদীশাসন ও পিলার বসানোর পর ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারের ওপর ভাসমান ক্রেনের সাহায্যে প্রথম স্প্যানটি বসানো হয়। একে একে শেষ হয় সকল কাজ। প্রায় ৭০০ প্রকৌশলী আর ১৭ হাজার কর্মীর নিরলস শ্রমে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। ১৮.৩ মিটার উচ্চতার জাহাজ এই সেতুর নীচ দিয়ে অনায়াসে যেতে পারবে।

২৫শে জুন ২০২২ তারিখটি বাংলাদেশের ইতিহাসের এক সোনালি দিন, সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ নামের মহিমা। আর তার মধ্যমণি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মহান জাতীয় সংসদে তাই গর্বভরে উচ্চারিত হয়েছে– পদ্মা সেতু নিয়ে দেশ-বিদেশে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে, কিন্তু নিজেদের টাকায় এই সেতু নির্মাণ করে ষড়যন্ত্রকারীদের সমুচিত জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মা সেতু সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক এবং অপমানের প্রতিশোধ। এই সেতু শুধু সেতু নয়, এটি প্রকৌশল জগতে এক বিস্ময়। প্রমত্তা পদ্মা নদীর বুকে দৃশ্যমান পদ্মা সেতু মানে স্বপ্নের বাস্তবায়ন, বাংলার মানুষের জয়, বঙ্গবন্ধুকন্যার জয়।

তথ্যসূত্র: www.padmabridge.gov.bd, *উইকিপিডিয়া*, ড. মোহাম্মদ আলী খান, *বর্ণে শব্দে চিত্রে ফরিদপুর*, *দৈনিক প্রথম আলো*, *দৈনিক যুগান্তর* ইত্যাদি

ড. মোহাম্মদ আলী খান: লেখক, গবেষক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব, khanma1234@gmail.com

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৮ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অবদানকে চিরস্মরণীয় করার লক্ষ্যে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব' পদক দেওয়া হয়। পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর পক্ষ থেকে পদক তুলে দেন এ অনুষ্ঠানের সভাপতি মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজসেবা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পাঁচ জন নারীকে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২' দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিবস ৮ই আগস্টকে সরকার 'ক' শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাই বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদকটি 'ক' শ্রেণিভুক্ত সর্বোচ্চ জাতীয় পদক।

সম্মাননা পাওয়া বিশিষ্ট পাঁচ জন নারী হলেন– রাজনীতিতে সিলেট জেলার সৈয়দা জেবুন্নেছা হক, অর্থনীতিতে কুমিল্লা জেলার সংসদ সদস্য সেলিমা আহমাদ, শিক্ষাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য (প্রোভিসি) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, সমাজসেবায় কিশোরগঞ্জ জেলার মোছা. আছিয়া আলম এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য (যুদ্ধকালীন কমান্ডার)।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

শুদ্ধাচার স্লোগান

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

ছিয়াত্তরে পা রাখছেন শেখ হাসিনা

জাফর ওয়াজেদ

২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিয়াত্তরে পা রাখছেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, শোক-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার পাশাপাশি দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসার ভেতর দিয়ে পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে তিনি পা রাখছেন ছিয়াত্তর বছরে। জন্মেছিলেন এই বাংলায় একটি রাজনৈতিক পরিবারে। পিতার আরাধ্য অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে জাতিকে সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে গত চার দশক ধরে নিরলস তিনি শ্রমে, কর্মে, সৃজনে, উত্তরণে। তিনি শেখ হাসিনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা, বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী।

চতুর্থ দফা রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষতা কুশলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন গোটা জাতিকে। তাই নানা ইস্যুতে জাতিও ঐক্যবদ্ধ তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে। পিতার মতোই গভীর দেশপ্রেম ও দুর্জয় সাহস, প্রজ্ঞা, ধৈর্য এবং সকল প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে এগিয়েছেন ক্রমশ সামনে। লক্ষ্য স্থির তাঁর। বাংলার মানুষের সঙ্গে অধিকার আদায়ের জন্য পাড়ি দিয়েছেন দীর্ঘপথ। ব্যক্তিগত লোভ-লালসা নিয়ে নয়, রাজনীতি করেন জাতির পিতার আদর্শ নিয়ে। দুঃখী মানুষের মুখে তিনি চান হাসি ফোটাতে ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

তিনি শেখ হাসিনা, যাঁর চার দশকের রাজনীতিক জীবনজুড়ে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধময় ঝড়ো হাওয়ার মোকাবিলা, ঘাতকের হত্যা প্রচেষ্টা, চক্রান্ত, নির্যাতন, জেল-জুলুম সয়ে যেতে হয়েছে। পুরো জীবনই তাঁর নিবেদিত বাঙালি ও এই বাংলার মানুষের জন্য। আর এজন্য তাঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে বহুবার। পিতা-মাতাসহ পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যার পর ঘাতকচক্র তাঁকেও বিনাশে কতশত অপচেষ্টা ও চক্রান্তই না চালিয়ে যাচ্ছে আজও। কিন্তু তিনি রয়েছেন এই বাংলার মানুষের অন্তরজুড়ে। বয়সি মানুষের কাছে তিনি তো আজও 'শেখের বেটি'।

কত গভীর মমত্ববোধে মানুষ তাঁকে আপ্লুত করে, শুভাশিস জানায়। বাস্তবে তিনি রাজনীতিক থেকে ক্রমান্বয়ে পরিণত হয়েছেন স্টেটসম্যানশিপে। 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' -এর মতোই বিশ্বজুড়ে এই একুশ শতকে বাংলাদেশ পরিচিত হচ্ছে 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' হিসেবেই। বাঙালির সহস্র বছরের সাধনাকে পাথেয় করে বাঙালি জাতিসত্তার আসন বিশ্ব দরবারে উঁচু রাখার সর্বসাধ্য প্রচেষ্টা বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার। তাই মানব সম্পদকে জনশক্তিতে রূপান্তর ঘটাতে সচেষ্ট তিনি। বাংলার সম্পদকে রক্ষা ও কাজে ব্যবহৃত করে উন্নত দেশ ও জাতিতে উন্নীত করায় শেখ হাসিনা তাঁর স্বপ্নের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন দীপ্ত আলোক মশাল হাতে। তাঁর দেশপ্রেম, সাহস, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার কোনো তুলনা নেই। বাংলায় গণতন্ত্র ও গণ-অধিকার রক্ষার লাগাতার সংগ্রামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নেত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। তাঁকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি অচল। এই সত্যটি এদেশের গণতন্ত্রের শত্রুরাও জানেন।

আমাদের স্মরণে আসে, প্রায় ৪১ বছর আগের এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে'র দৃশ্যপট। দখলদার জান্তার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ফিরে এলেন বাংলার ইতিহাসের ট্র্যাজেডি কন্যা শেখ হাসিনা নিজ মাতৃভূমিতে। সেদিন লাখ লাখ মানুষ তাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীকে বরণ করে নিতে কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের সামনে উন্মুখ। পুরো শহর পরিণত জনসমুদ্রে। তিনি এলেন সেই ভূমিতে, যেখানে নির্মম নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। হত্যাকারী ও তাদের বশংবদরা দখলে রেখেছে রাষ্ট্র ও ক্ষমতা।

তিনি ফিরে এলেন দীর্ঘ নির্বাসন শেষে। যেমন এসেছিলেন পিতা। নেতা-কর্মী ও জনতার আবেগে সিক্ত হয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বাংলার মাটিতে নেমে বলেছিলেন স্বজনহারা শেখ হাসিনা– 'আমার হারাবার আর কিছু নেই। বাবা-মা-ভাই, আত্মীয়–স্বজন সবাইকে হারিয়ে আজ আমি নিঃস্ব। আমি আপনাদের কাছে শপথ করছি, আমার দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে যাবো।'– জানা ছিল তাঁর, এই লড়াইয়ের পথে পথে শ্বাপদসংকুল পথ, পদে পদে বাধাবিপত্তি, নিষেধাজ্ঞা, শাসন-ত্রাসন, জেল-জুলুম শুধু নয়– জীবনও হতে পারে বিপন্ন। তবু এই শপথের আলোয় আলোকিত হয়ে তিনি প্রায় একচল্লিশ বছর ধরে এসব মোকাবিলা করে এখনও সক্রিয় মানবমুক্তির লড়াই-সংগ্রামে। মানুষের জন্য, মানবতার জন্য নিরলস প্রয়াস তাঁকে জননেত্রীতে পরিণত করেছে।

ঘাতকের অস্ত্র বহুবার আঘাত হেনেছে, সহকর্মীরা খুন হয়েছে, মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছেন। কিন্তু দমে যাননি। বরং 'জীবন মরণ পায়ের চরণ' করে আরও উদ্দীপনায় মানুষের পাশে থেকে মানুষের উত্থানে এখনও সব তুচ্ছ জ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছেন। যেমন এগিয়েছিলেন পিতা। গ্রেনেড হামলা চালিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় হত্যা করার চেষ্টাও হয়েছে। নির্জন সেলে বন্দি করে মধ্যযুগীয় প্রথায় বিষ খাইয়ে মারার অপচেষ্টাও হয়েছে। দেশ থেকে, রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করার কঠোর কঠিন দমন, পীড়ন, নির্যাতনও চলেছে। কিন্তু কিছুই টলাতে পারেনি। নিজের আত্মবিশ্বাস ও বাংলার মানুষের বিশাল সমর্থন নিয়ে অন্ধ প্রকোষ্ঠে থেকেও দৃঢ়তার সঙ্গে সবকিছু মোকাবিলা করেছেন। সাহস তাঁকে দিয়েছে প্রেরণা। জুগিয়েছে অজস্র উদ্দীপনা। নতজানু না হওয়ার মন্ত্র তো তাঁর আজন্ম। আপোশহীন দৃঢ়তায় তিনি সব ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেছেন।

দেশের মাটিতে চল্লিশ বছর আগে ফিরে যে শপথ উচ্চারণ করেছিলেন শোকাতুর কণ্ঠে, সে শপথ থেকে চ্যুত করার সব ষড়যন্ত্র, প্রতিরোধ মোকাবিলা করেছেন। শোককে পরিণত করেছেন শক্তিতে। দৃঢ়তা, একাগ্রতা, সাহস, নিষ্ঠা, মানবতা, নৈতিকতা, দূরদর্শিতা–সবকিছুকেই তিনি সমন্বিত করেছেন নিজস্ব চেতনায়। আর সেই চেতনার

আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। গৌরবের মশাল বহন করে তিনি এগিয়ে চলেছেন বিশ্বের ক্ষুধা, দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের পক্ষে। বিশ্বমানবতাকে তাই বার বার আহ্বান করে আসছেন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়তে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে চান শান্তি। হিংসা, হানাহানি নয়, সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠুক মানুষের মধ্যে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় মানবতার মহত্ত্বকে এগিয়ে নিতে। আর এই সবকিছু শেখ হাসিনাকে পরিণত করেছে স্টেটসম্যানশিপে। মৃত্যুভীতি তাঁকে আর তাড়া করে না। মরণের পথ থেকে গত একচল্লিশ বছরে কতবারই ফিরে এসেছেন।

সেই ১৯৮১ সালে পিতার প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনকারী দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ হাসিনা *নিউজউইক* পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'সরকারের শক্তিকে পরোয়া করি না, মৃত্যুকেও না। জীবন তো একটাই, এক জীবনেই ঝুঁকি নিতে হবে। মৃত্যুকে ভয় করলে জীবনের কোনও মর্যাদা থাকে না। সমগ্র জাতির পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারই হবে আমার অন্যতম অগ্রাধিকার। আমার বাবার প্রতি দেশের জনগণের প্রচণ্ড ভালোবাসা ও মমতা রয়েছে। জাতির জন্য তার যে স্বপ্ন তা আমি পূরণ করবো।'– চলেছেনও তিনি সেই পথেই। যে পথে আছে বাঙালির মুক্তি, মানবতাবোধ, দেশপ্রেম ও সাহসী নেতৃত্বের জন্য বাংলার দুঃখী মানুষের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

মৃত্যুশোক জননেত্রীর জন্য শুধু অশ্রুর মালাখানি, সংখ্যাহীন গৃহীর ঘরে প্রতিদিন যেমন সে গাঁথে। মৃত্যু তাঁকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে চেতনার এক স্তরে। দুঃসাধ্য চেষ্টার ভেতর দিয়েই তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ হন। মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে তিনি যেন নবজন্মে প্রবেশ করেছেন। পৃথিবীতে যখন প্রথমবার আলো লাভ করে মানবশিশু। সেটা শিশুর আলোকপ্রাপ্তির মতো। তাতে কোনো কঠিন সাধনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মৃত্যুশোক অতিক্রম করে বিশ্ব যদি আবারও ব্যক্তির দৃষ্টিতে 'আলোয় আলোকময়' হয়, তবে সেটা সাধনালব্ধ ধন। মৃত্যু অন্য এক শিক্ষা দেয়। শেখ হাসিনা সেই আলোকময় বিশ্বের জন্য নিরলস প্রয়াসে ব্যাপ্ত। দেশের মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসার গভীরতায় সর্বস্ব ত্যাগ করে দিয়েছেন। জীবনকে উৎসর্গ করেছেন দেশ, মাটি ও মানুষের জন্য। অথচ তারই দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ করা হয়। করে যারা, তাদের অতীত তো কলুষময়। তাই এসব কলুষতা কখনো স্পর্শ করে না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি জনগণকে ভালবাসি। জনগণ আমাকে ভালবাসে। তারা কি কখনো অনিষ্ট করতে পারবে?'– না, জনগণ তা করেনি। বাংলার মানুষ একাত্তর সালের নয় মাস পাকিস্তানি কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রার্থনা করেছে। স্বাধীন বাংলায় বেঁচে থাকা জাতির পিতার দুই কন্যার জন্য বাংলার মানুষ এখনও দুহাত তুলে প্রার্থনা করে তাঁদের মঙ্গল, কল্যাণ ও দীর্ঘায়ুর জন্য। ষাটতম জন্মদিন শেখ হাসিনাকে পালন করতে হয়েছে কারান্তরালে। পিতার মতোই জেল-জুলুম, মেনে নিয়েছেন। বুদ্ধিজীবীরাও বলেন, 'পিতার আরব্ধ কাজ শেষ করার দায় তো ইতিহাস তাঁর কাঁধেই চাপিয়েছে। একবার বঙ্গবন্ধুর জাদুকরি নেতৃত্বে বাঙালি তার অভ্যাসের গণ্ডি ভেঙে জাতি হিসেবে বড়ো হয়ে উঠেছিল এবং সেই জোরেই স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল।'

এবার অচলায়তন ভেঙে সামনে এগোতে হলে, সম্মান নিয়ে বাঁচতে হলে আবারও বাঙালিকে সব ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ও স্বার্থের গণ্ডি ভেঙে বড়ো হয়ে উঠতে হবে। সেই কাজে কে আর নেতৃত্ব দেবে? বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ছাড়া? বাঙালি জাতির দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে নতুন যুগের নতুন রাজনীতির মন্ত্রে নতুন প্রজন্মের বাঙালিকে জাগিয়ে আবারও ঐক্য, ত্যাগ ও কর্মের বাতাবরণ তৈরি করে বাঙালিকে বড়ো করে তোলার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তা বাস্তবায়নে বাংলার মানুষই সমর্থন জোগাবে। বলেছেনও শেখ হাসিনা, ব্যক্তিগত লোভ-লালসার রাজনীতি তিনি করেন না।

চার দশকের ইতিহাস তো এই সত্যতা প্রমাণ করে দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি ছাড়া আর কোনো কিছুতেই মোহ নেই। তাই দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে দেশকে অভিশাপ মুক্ত করেছেন তিনি। বাঙালি জনগোষ্ঠীর মনোজগতে শেখ হাসিনা এক নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। একুশ শতকের বাংলা গড়তে চান তিনি। এই বাংলা গড়ার মাধ্যমেই তিনি জবাব দেবেন বঙ্গবন্ধু হত্যার। জানেন তিনি, এই কাজে পদে পদে পেরুতে হবে বাধাবিপত্তি এবং তিনি যে তাতে সফল হবেন, তাঁর কর্মকাণ্ড সেই জানান দেয়। জনগণের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ দেশ গড়ার কাজে নিজেকে ব্রতী করেছেন।

বিশ্বনেত্রী শেখ হাসিনা ইতিহাস কন্যা। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাসের নানা অধ্যায় দেখেছেন। অনেক অত্যাচার-নির্যাতন সয়েছেন সপরিবার। সেই ইতিহাস এক রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ইতিহাস। তাঁর বাল্যকাল ও তারুণ্য কেটেছে সামরিক শাসনে। বাঙালিরা স্বভাবজাত সামরিকতন্ত্রের বিরোধী। ১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক শাসন, রাজনৈতিক নেতাদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন যেমন দেখেছেন, তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক জান্তার একই আচরণ দেখেছেন। এমনকি দুর্বিষহ নিপীড়নও ভোগ করেছেন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের দীর্ঘ সামরিক শাসন থেকে দেশকে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য যে নিরলস সাধনা, সেখানে কোনো আপোশ নেই। নির্বাচনকে তিনি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবেও এক সময় বেছে নিয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক পরিবারে জন্ম বলে ধর্ম কখনো বাধা হয়ে থাকেনি সব মানুষের সঙ্গে মেশার ক্ষেত্রে।

তিনি মহীয়সী শেখ হাসিনা, যাঁকে গত চল্লিশ বছরে প্রায় প্রতিদিনই মুখোমুখি হতে হয়েছে পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ স্বজনহারা শোকাতুর মানুষের। নিজের শোককে শক্তিতে পরিণত করে শোকাতুর মানুষকে বুকে জড়িয়ে যে সান্ত্বনা তিনি মেলেছেন, স্পন্দিত হয় তাদেরও বক্ষে শক্তিমত্তা। আর সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে জাগরূক হয়ে উঠুক মানুষ আবার। যেমন তিনি দাঁড়িয়েছেন নিজের সমস্ত জীবনকে মানুষের জন্য উৎসর্গ করে, মানুষেরই পাশে।

'স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড় বেদনার'– বলেছেন শেখ হাসিনা স্মৃতিচারণে। দুঃখে-সুখে গড়া জীবনে বেড়ে ওঠা তাঁর। উপলব্ধি করেন, বাঙালি জাতির জাগতিক উত্থান ও বিকাশের প্রয়োজন। বিস্মৃতি স্পর্শ করে না বলে সবকিছু গোছানো। ভাষণে-বক্তৃতায় ধারাবাহিকতায় তুলে আনেন সত্য ইতিহাসের সোনালি-রুপালি এবং ট্র্যাজিক ইতিহাস। এটা তো সত্য, ট্র্যাজেডির জীবন তাঁর। আমাদের সমকালে, তিনিই একমাত্র রাজনৈতিক, যাঁকে হারাতে হয়েছে সব। আর তাঁর এই হারানো আসলে পুরো জাতির জন্যই হারানো। বাঙালির জীবনে একমাত্র ট্র্যাজেডি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের নৃশংসতা। ট্র্যাজেডির কন্যা তিনি। পিতৃহন্তারকরা চেয়েছে তাঁর বিনাশ। প্রাণনাশের কত শত আয়োজন হয়েছে। স্বয়ং রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকেও তাঁর প্রাণহরণের চেষ্টা চলেছে। হত্যার অপচেষ্টা চলে আসছে সেই একাশি সালে দেশে ফেরার পর থেকে।

শেখ হাসিনা পিতা বঙ্গবন্ধুর মতোই 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে এগিয়ে চলেছেন বিশ্বমানবের মুক্তির সাধনায়। শেখ হাসিনার জন্মদিনে জাতি কৃতজ্ঞতাচিত্তে প্রার্থনার দু'হাত তুলে দীর্ঘায়ু কামনা করে। ছিয়াত্তর বছর বয়সেও তিনি থাকুন সক্রিয়, সচল ও কর্মপ্রাণ। থাকুন জাতির আশা-ভরসার স্থল হিসেবে। জয়তু বিশ্ব নেত্রী শেখ হাসিনা।

জাফর ওয়াজেদ: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, লেখক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি), dg@pib.gov.bd, dgpib@yahoo.com

আপনিই তো বাংলাদেশ

নাসির আহমেদ

প্রতিটি মানুষের জন্মদিনই তার নিজের কাছে যেমন পরিবারের কাছেও তেমনি আনন্দের এবং স্মরণীয়। কিন্তু কারও কারও জন্মদিন ব্যক্তি ও পরিবারের সীমানা ছাড়িয়ে রাষ্ট্র আর সমাজের মানুষের কাছেও পরম আনন্দ আর গৌরব বয়ে আনে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার জন্মদিনটি সেরকম আনন্দ আর গৌরবের। কারণ তিনি একটি জাতিরাষ্ট্রকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শুধু রক্ষাই বা বলি কেন, বিশ্বের বুকে এই দেশটিকে মহিমান্বিতও করেছেন। পঁচাত্তর-পরবর্তী বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ যে অন্ধতিমিরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, শেখ হাসিনা ফিরে না এলে পরিণাম কী হতো তা বিবেকবান মানুষ মাত্রই কল্পনা করতে পারেন।

প্রতিবছর দেশে-বিদেশে তাঁর অনুরাগীরা, বঙ্গবন্ধুর প্রগতিশীল রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারীরা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন নানা আয়োজনে। এবারও রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গসংগঠনসমূহ ব্যাপক আয়োজনে প্রিয় নেত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবেন। করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন গত দুই বছর অনাড়ম্বরেই উদ্‌যাপিত হয়েছে ঘরোয়া পরিবেশে। তাঁর অফিস কিংবা গণভবনে শুভেচ্ছা জানাতে কেউ যেতে পারেননি বটে, তারা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফেসবুকসহ নানা সামাজিক নেটওয়ার্কে।

কিন্তু এর বাইরেও এমন বহু মানুষ আছেন, যারা আওয়ামী লীগের কোনো পর্যায়ের নেতাও নন, কর্মীও নন অথচ শেখ হাসিনার সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং নিরহংকার, নির্লোভ সরল জীবনযাপন পছন্দ করেন, তারাও দূরে থেকেই তাঁর জন্য শুভকামনা জানাচ্ছেন, দোয়া করছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তারা পরিচিতও নন। কিন্তু তারা ভালোবাসেন তাঁকে। তাঁর সুখে-দুঃখে উদ্বেলিত হন এসব মানুষ। এই জনসাধারণের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাতেই বঙ্গবন্ধু মহান নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই দুঃখিনী বাংলার দুঃখ মোচনের জন্য।

সেই বিপুল সংখ্যক সাধারণেরই একজন হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। লাখো শহিদের রক্তস্নাত এই জন্মভূমির কল্যাণের প্রয়োজনেই আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু হোক। বার বার ফিরে আসুক জন্মতিথির উজ্জ্বল সোনালি সকাল।

সোনালি সকাল আর শেখ হাসিনার জন্মদিন প্রায় সমার্থক। কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন এক আশ্চর্য অধ্যায় তিনি রচনা করেছেন, যা অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি দেশের মানুষের জন্য দীর্ঘ অন্ধকার শেষে সোনালি সূর্যোদয় দেখারই আনন্দের তুল্য। দীর্ঘ অন্ধকার কথাটার ব্যাখ্যা দরকার। ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তফসল এই বাংলাদেশ ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের প্রত্যুষে সপরিবার জাতির পিতাকে হত্যার পর ভয়ংকর অন্ধকারের দিকেই যাত্রা করেছিল! সেই অন্ধকার মানে মুক্তিযুদ্ধের প্রগতিশীল রাষ্ট্রচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এক অপ্রত্যাশিত সাম্প্রদায়িকতা আর সামরিকতন্ত্র কবলিত পাকিস্তানি দর্শনের বাংলাদেশ।

এই অন্ধকারই পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোয় ২৩ বছর জগদ্দল পাথরের মতো চেপেছিল এই বাংলার বুকে। বঙ্গবন্ধুর চরম আত্মত্যাগ আর নিরন্তর কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে একাত্তরেই মুছে গিয়েছিল সেই অন্ধকার। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তা আবার ফিরে আসে। যে অন্ধকার তাড়াতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সারা জীবন সংগ্রাম করতে হয়েছে, চরম ত্যাগ স্বীকার করে এই জাতিকে ২৩ বছরের পাকিস্তানি দুঃশাসনের শৃঙ্খল ছিঁড়ে স্বাধীনতার সোনালি সূর্যের মুখোমুখি করেছিলেন ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক মার্চে। একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম দেশের পতাকা উঁচু করে ধরেছিল পৃথিবীর বুকে।

স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে নিমগ্ন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতাকে হত্যার প্রেক্ষাপট সৃষ্টিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাস তথা আন্ডারগ্রাউন্ড অপতৎপরতা, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে দেশের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে নানামুখী তৎপরতা আর অপপ্রচার এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, বঙ্গবন্ধুকে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়ে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার পথে যেতে হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি। কিন্তু দ্বিতীয় বিপ্লব বাস্তবায়নের আগেই শিশুসন্তানসহ সপরিবার তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী দেশি-বিদেশি চক্র বাংলাদেশকে তার কক্ষচ্যুত করে নিয়ে যেতে থাকে সামরিক শাসন, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ আর সন্ত্রাসের ভয়ংকর অন্ধকার পথে! সেই অন্ধকার তাড়াতে ছয় বছরের নির্বাসন জীবন থেকে বেরিয়ে এসে কঠোর সংগ্রামের পথে নামতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনাকেই। পিতার গড়া ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের চরম সংকটের মুহূর্তে কাণ্ডারি হিসেবে হাল ধরতে হয়েছে তাঁকে। শেখ হাসিনার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে পাকিস্তানি সামরিক শাসন আর সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল বাংলাদেশ একটি প্রগতিশীল

রাষ্ট্র হিসেবে, সেই পথ উলটো করে দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী এবং খুনিচক্রের সহযোগীরা। সামরিক শাসকেরা বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ক্ষমতা দখল করেই তুষ্ট ছিল না, তারা বাংলাদেশকে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকতা আর সামরিক শাসনের অন্ধকারেও নিমজ্জিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার গৌরবের অধিকারী আওয়ামী লীগও নেতৃত্ব সংকটে পড়ে যায়। এরকম একটা সংকটময় সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে দেশে ফিরিয়ে আনে এবং শেখ হাসিনাকেই দলের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয় সর্বসম্মতভাবে। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে স্বজনহারা শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফেরার পর থেকে বাংলাদেশে শুরু হয় তাঁর মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অস্তিত্ব ফিরিয়ে আনার জীবনপণ সংগ্রাম।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে অন্তত ১৯ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়। সবচেয়ে ভয়ংকর চেষ্টাটি ছিল ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে।

সেদিনের সেই সমাবেশে হামলার লক্ষ্য ছিল একটাই– শেখ হাসিনাসহ দলের শীর্ষ নেতাদের একসঙ্গে গ্রেনেড ফাটিয়ে নির্মূল করে দেওয়া। আইভি রহমানসহ অনেকে নিহত এবং শত শত মানুষ গ্রেনেডের স্প্রিন্টারে ক্ষতবিক্ষত হলেও সৌভাগ্যক্রমে নেতাকর্মীদের মানবঢালের সহায়তায় বেঁচে গিয়েছিলেন তৎকালীন সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা। এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রকাশ্য দিবালোকে এই ভয়ংকর হামলায় যে গ্রেনেডগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল, তা পাকিস্তানে তৈরি এবং তাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরাই ব্যবহার করে থাকে।

সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে তৈরি সামরিক বাহিনীর এই মারণাস্ত্র কেমন করে বাংলাদেশে এল এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ আহূত শেখ হাসিনার শান্তি সমাবেশে ব্যবহৃত হলো– এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই বেরিয়ে আসবে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট সপরিবার জাতির পিতাকে হত্যার সঙ্গে শেখ হাসিনা হত্যাচেষ্টার কী নিবিড় গোপন ষড়যন্ত্রের যোগ! কারা ছিলেন এই নৃশংসতার সঙ্গে জড়িত? গ্রেনেড হামলার সমস্ত আলামত হামলার পরপরই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে মুছে ফেলা, জজ মিয়া নাটক সৃষ্টি করে এই হত্যা চক্রান্তের সঙ্গে জড়িতদের আড়াল করার অপচেষ্টা এবং এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা।

শেখ হাসিনা যে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ এবং সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার এবং প্রগতির বাতিঘর হবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। আর সে কারণেই দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের প্রগতিশীল পেশাজীবীরা যেমন, তেমনই সমাজের সচেতন মানুষের সমর্থন ও ভালোবাসায় অভিষিক্ত হয়েছেন দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

গ্রেনেড অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল তারা। ২০০৬ সালের অক্টোবরে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাই রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে বসিয়ে আবার ক্ষমতায় যাবার জন্য চারদলীয় জোট সৃষ্টি করেছিল রাজনৈতিক সংঘাতময় পরিস্থিতি! যার ফসল ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারির সামরিক বাহিনী সমর্থিত তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা মঈনউদ্দিন-ফখরুদ্দিন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ।

সে সরকারও অবৈধ পথে ক্ষমতায় থেকে যেতে চেয়েছিল। তাদের টার্গেট ছিল শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে সরানো। চাঁদাবাজির মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে কারারুদ্ধও করা হয়েছিল। তার আগে সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারই তাঁকে দেশে ফিরতেও বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সকল বাধা তুচ্ছ করে সাহসী জননেত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের সংগ্রামে শামিল হয়েছেন। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হলে ২০০৯ সালে পুনরায় রাষ্ট্রপরিচালনা শুরু করেন দেশরত্ন শেখ হাসিনা। সে পথেও বাধা কম ছিল না।

২০০৯ সাল থেকে টানা তিনটি মেয়াদে সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে দক্ষতা আর দূরদর্শিতার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করছেন, তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গত এক যুগের বাংলাদেশের দিকে তাকালে বোঝা যায়, কী বিস্ময়কর পরিবর্তনই তিনি ঘটিয়েছেন এই বাংলায়। দেশকে ডিজিটাইজেশন করে অর্থনৈতিক এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে যে নতুন যুগের সূচনা করেছেন, ২০০৯ সালেও কেউ তা কল্পনা করতে পারেননি। নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার বিস্ময়করভাবে কমিয়ে আনা, শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার, বিশেষ করে নারী শিক্ষা প্রসারে এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক গতির সঞ্চার হয়েছে।

বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতাসহ নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গতি সঞ্চার করাসহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যা মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে, সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত করে বাংলাদেশকে নতুন যুগে প্রবেশ করিয়েছে। মাত্র এক যুগের মধ্যে দারিদ্র্যপীড়িত দেশটি আজ উন্নয়নশীল মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে। বাংলাদেশ আজ বিশ্ববাসীর কাছে শুধু বিস্ময় নয়, উন্নয়নের রোল মডেলও। এর সবকিছুই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য দেশপ্রেম, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা আর লক্ষ্যে অবিচল সাহসী সিদ্ধান্তের কারণে। দেশি-বিদেশি নানা চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের পরও নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে তিনি শুধু বাংলাদেশের মানুষকে বিস্মিত করেননি, সপ্রশংস দৃষ্টি কেড়েছেন আন্তর্জাতিক দুনিয়ারও।

বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য পদ্মা সেতুর মতো বিশাল সেতু প্রমত্তা পদ্মার বুকে সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে বাস্তবায়ন সব অর্থেই প্রায় অসম্ভব ছিল। বিশ্বের অন্যতম প্রবল স্রোতস্বিনী পদ্মার মতো উত্তাল নদীকে শাসন করা প্রায় দুঃসাধ্য এক সাফল্যের কাজ। তদুপরি বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের নানামুখী ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে পদ্মার বুকে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ ছিল অসম্ভব প্রায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন– দেশীয় অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হবে, তখন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন এবং অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বাংলাদেশের একার পক্ষে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব নয়।

গভীর দেশপ্রেম আর আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন এবং পদ্মা সেতু নির্মাণ করে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের সক্ষমতা শুধু প্রমাণ করেননি, দেশকে অনন্য উচ্চতায় তুলে দিয়েছেন। তাঁর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, গভীর দেশপ্রেম আর সুযোগ্য নেতৃত্বই বাংলাদেশকে আজ বিশ্বসমাজের এত বড়ো সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

উন্নয়নের নানা সূচকে সফলতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ এবং শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক বহু স্বীকৃতি এবং সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা এযাবৎ তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার-সম্মাননা ও স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। এর কয়েকটি অর্জনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়।

১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর দীর্ঘকালের অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাঁর সরকার যে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করাতে সক্ষম হয়েছিল, তা শুধু দেশে নয় বহির্বিশ্বেও ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছিল।

জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ইউনেসকো 'হোপে বোয়ানি শান্তি পুরস্কার' প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত করেছিল। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ইউনেসকোর তৎকালীন মহাপরিচালক ফেদেরিকো মেয়র যে মন্তব্য করেছিলেন তার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে: 'জাতি গঠনে আপনার পিতার নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে আপনি দেশকে শান্তি ও পুনর্গঠনের পথে নিয়ে গেছেন। দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার উদ্যোগ ও নিষ্ঠা বিশ্বে শান্তির সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

জাতিসংঘের আরেক অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'চেরেস পদক' প্রদান করে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্ব ফোরাম পরিবেশ সুরক্ষায় শেখ হাসিনার সৃজনশীল নেতৃত্বের অসাধারণ ভূমিকার জন্য পরিবেশ বিষয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মান 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত করে ২০১৫ সালে। 'গ্লোবাল সামিট অব ওমেন' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০১৮ সালে 'গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। দেশে নারী শিক্ষার উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে অসামান্য নেতৃত্বদানের জন্য তাঁকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

মিয়ানমার থেকে নির্যাতিত হয়ে বিতাড়িত ১১ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে অতুলনীয় মানবতাবাদী নেতার ভূমিকা পালন করেছেন, সেজন্য বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নিউজ এজেন্সি আইপিএম তাঁকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' উপাধিতে ভূষিত করে। শুধু তাই নয়, তিনি আইপিএম ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১৮ সালের স্পেশাল ডিস্টিংশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।

জাতিসংঘের ইউএন উইমেন থেকে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন', গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম থেকে 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' পুরস্কারসহ অনেক সম্মাননা ও স্বীকৃতিতে বাংলাদেশকে বিশ্বে মর্যাদাবান একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশ্বখ্যাত *ফোর্বস* ম্যাগাজিনের জরিপে বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় স্থান পান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর পুরস্কার এবং সম্মাননার দীর্ঘতালিকা তুলে ধরা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্রকে কতটা মাথা উঁচু করে দাঁড় করানো যায় সঠিক সুযোগ্য নেতৃত্বের গুণে, সেই সত্যটাই উপলব্ধি করা।

করোনা আক্রান্ত পৃথিবীতে গত তিন বছর যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় বিশ্বের উন্নত দেশগুলোকেও যে চরম দুর্ভোগ আর দুর্যোগে ঠেলে দিয়েছে, সেসময়ে বাংলাদেশ কর্মহীন দরিদ্র মানুষকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, বিশ্বের উন্নত অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ক্ষয়ক্ষতি অনেকখানি রোধ করতে সক্ষম হয়েছে কেবল সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যোগাযোগ ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে উন্নীত করার সুফল মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে করোনাকালীন বিচ্ছিন্ন সময়ে। সারা দেশের সঙ্গে তৃণমূল প্রশাসনের সঙ্গে সরকারপ্রধান নিয়মিত বৈঠক করেছেন, প্রতিটি অফিস-আদালত দক্ষতার সঙ্গে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়েছে, দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে অনলাইন প্রক্রিয়ায় পাঠদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে কেবল ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সুবাদেই। রাজধানীর সঙ্গে সারা দেশের সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নতুন যুগের সূচনা হয়েছে গত এক যুগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে।

বাংলাদেশের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি, তা দেখে কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে:

> দেশপ্রেমী তুমি জনকের মত তুমি যে তুলনাহীন
> সত্যে-সাহসে অবিচল তুমি, আশাবাদী চিরদিন।
> আশার রৌদ্র ছড়াও তুমি যে এদেশে প্রতিটি ভোরে
> বাংলার নীল আকাশে তাইতো শান্তি-পায়রা ওড়ে।

এই লেখা দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের আংশিক মূল্যায়নও নয়, জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যার অবদানের একটি সামান্য রেখাচিত্রই অঙ্কন মাত্র।

প্রথম একুশে সংকলনের সম্পাদক ও *মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র*-এর সম্পাদক প্রখ্যাত কবি হাসান হাফিজুর রহমান বহু বছর আগে শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আপনিই তো বাংলাদেশ'। এত বছর আগে কেন তা বলেছিলেন তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব, আজ আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি– যখন তিনি শত প্রতিকূলতা আর ষড়যন্ত্রের মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবে রূপায়িত করে চলেছেন।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর। জাতি হিসেবে বাঙালি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে এই বাংলাদেশ হয়ে উঠবে উন্নত, সমৃদ্ধ সত্যিকারের সোনার বাংলা–এই ছিল জাতির পিতার স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনা সেই স্বপ্নই একের পর এক বাস্তবায়ন করে চলেছেন। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ মহিমান্বিত জাতিরাষ্ট্র।

গত এক যুগে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের যে অর্জন তার উল্লেখ না করলে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের বিখ্যাত উক্তি যথার্থতা পায় না।

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে সম্মান ও সুবিধা বঙ্গবন্ধুকন্যা নিশ্চিত করেছেন, তা তুলনাহীন। বাংলাদেশে যাতে কোনো দরিদ্র মানুষ গৃহহীন না থাকে, এই লক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে ইতোমধ্যেই লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে নির্মাণ করে দিয়েছেন বাড়ি। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীজুড়ে অব্যাহত ছিল দরিদ্র মানুষের গৃহায়নের কর্মসূচি যা এখনও চালু আছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সমস্ত গৃহহীন মানুষকেই আবাসন নিশ্চিত করার কর্মসূচি এগিয়ে চলেছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ টিকিয়ে রাখতে হলে আপনার কোনো বিকল্প নেই। জয়তু বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

নাসির আহমেদ : বিশিষ্ট কবি ও সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক পরিচালক (বার্তা) বাংলাদেশ টেলিভিশন, nasirahmed1971@gmail.com

তোশাখানা জাদুঘরের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে পিতার প্রতিকৃতির সামনে দুই বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট এবং শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার নির্বাসিত জীবন

ড. আফরোজা পারভীন

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ ভোরে একদল বিপথগামী সেনার হাতে নিহত হয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেদিন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে আরও নিহত হন বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, জামালের স্ত্রী রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল, এসবি অফিসার সিদ্দিকুর রহমান, সেনা সদস্য সৈয়দ মাহবুবুল হক। প্রায় একই সময়ে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে ও যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণির বাসায় হামলা চালায়। এসময় নিহত হন শেখ ফজলুল হক মণি, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি। একই সময় বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় হামলা করে। সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত বাবু, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বড়ো ভাইয়ের ছেলে সজীব সেরনিয়াবাত এবং আত্মীয় বেন্টু খানকে হত্যা করে। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন ব্যক্তিগত সহকারী প্রয়াত আ ফ মোহিতুল ইসলামের করা বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ১৪ই আগস্ট রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পর তাঁকে ডেকে তোলেন বাড়িতে কর্মরত টেলিফোন মিস্ত্রি। মিস্ত্রি বলেন, প্রেসিডেন্ট (বঙ্গবন্ধু) ডাকছেন। তখন সময় ভোর সাড়ে চারটা কী পাঁচটা। বঙ্গবন্ধু ফোনে তাঁকে বললেন, সেরনিয়াবাতের বাসায় দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ করেছে। তিনি অনেক চেষ্টার পরও পুলিশ কন্ট্রোল রুমে টেলিফোন লাইন পাচ্ছিলেন না। তারপর গণভবন এক্সচেঞ্জে লাইন লাগানোর চেষ্টা করলেন। এরপর বঙ্গবন্ধু নীচে নেমে এসে তাঁর কাছে জানতে চান, পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে কেন কেউ ফোন ধরছে না। এসময় তিনি ফোন ধরে হ্যালো হ্যালো বলে চিৎকার করছিলেন। বঙ্গবন্ধু তার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বললেন, আমি প্রেসিডেন্ট বলছি। এসময় দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে একঝাঁক গুলি এসে ঐ কক্ষের দেয়ালে লাগল। তখন অন্য ফোনে চিফ সিকিউরিটি মহিউদ্দিন কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। গুলির তাণ্ডবে কাঁচের আঘাতে মোহিতুল ইসলামের ডান হাত দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। এসময় জানালা দিয়ে অনর্গল গুলি আসা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শুয়ে পড়েন। মোহিতুলও শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর সাময়িকভাবে গুলিবর্ষণ বন্ধ হলে তাঁরা উঠে দাঁড়ান। ওপর থেকে কাজের ছেলে সেলিম ওরফে আবদুল বঙ্গবন্ধুর পাঞ্জাবি ও চশমা নিয়ে আসে। পাঞ্জাবি ও চশমা পরে বঙ্গবন্ধু বারান্দায় এসে দাঁড়ান। তিনি বলেন, আর্মি সেন্ট্রি, পুলিশ সেন্ট্রি এত গুলি চলছে তোমরা কী কর? এসময় শেখ কামাল বললেন, আর্মি ও পুলিশ ভাই আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। কালো পোশাক পরা একদল লোক এসে শেখ কামালের সামনে দাঁড়ালো। মোহিতুল ইসলাম ও ডিএসপি নূরুল ইসলাম খান শেখ কামালের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। এসময় শেখ কামাল গুলি খেয়ে তার পায়ের কাছে এসে পড়লেন। কামাল চিৎকার করে বললেন, 'ভাই ওদের বলেন, আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল।' তারপর তারা নূরুল ইসলামকেও গুলি করে।

কিছুক্ষণ পর নীচে থেকে তারা বঙ্গবন্ধুর উচ্চকণ্ঠ শুনলেন। গুলি চলার বিকট শব্দ শুনতে পেলেন তারা। শুনতে পেলেন মেয়েদের আর্তচিৎকার, আহাজারি। এরইমধ্যে শেখ রাসেল ও কাজের লোক রমাকে নীচে নিয়ে আসা হয়। রাসেল মোহিতুল ইসলামকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমাকে মারবে না তো।' তিনি বলেন, 'না তোমাকে কিছু বলবে না।'

শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসেল হত্যার মর্ম বিবরণ। তিনি *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন শেখ রাসেলকে হত্যার ঘটনা। তিনি উল্লেখ করেন, 'মৃত্যুর আগে শেখ রাসেল বলেছিলেন, আল্লাহর দোহাই আমাকে জানে মেরে ফেলবেন না। আমার হাসু আপা দুলাভাইয়ের সঙ্গে জার্মানিতে আছেন। আমি আপনাদের পায়ে পড়ি, দয়া করে আপনারা আমাকে জার্মানিতে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।'

ড. ওয়াজেদ তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেন, 'বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে হত্যার পর রাসেল দৌড়ে নীচে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো বাড়ির কাজের লোকজনের কাছে আশ্রয় নেয়। রাসেলের দীর্ঘকাল দেখাশুনার দায়িত্বে থাকা আবদুর রহমান রমা তখন রাসেলের হাত ধরে রেখেছিলেন। একটু পরেই একজন সৈন্য রাসেলকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর কথা বলে রমার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। রাসেল তখন ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে তাকে না মারার জন্য আল্লাহর দোহাই দেয়। রাসেলের এই মর্মস্পর্শী আর্তিতে একজন সৈন্যের মন গলায় সে তাকে বাড়ির গেটে সেন্ট্রিবক্সে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু এর প্রায় আধ ঘণ্টা পর একজন মেজর সেখানে রাসেলকে দেখতে পেয়ে তাকে দোতলায় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় রিভলবারের গুলিতে হত্যা করে।'

সবচেয়ে দুঃখজনক এটাই যে, দশ বছরের শিশুকে হত্যা করতেও তাদের হাত কাঁপেনি! হাত কাঁপেনি সদ্যবিবাহিত বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্রবধূকে হত্যা করতে! সুলতানা কামাল খুকী তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স পাস করে এমএ ক্লাসে ভর্তি হন। এমএতে লিখিত পরীক্ষা দেন। মৌখিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই ঘাতকদের বুলেটে তিনি নিহত হন। শেখ জামালের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ২৮ দিনের মাথায় শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন রোজী জামাল। মাত্র ১৭ বছর বয়স ছিল তাঁর। ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ির দোতলায় অন্য সবার মাঝে ঘাতকের বুলেটের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল সদ্যবিবাহিত খুকী আর রোজীর নিথর দেহ। তখনও তাঁদের দুহাতে শোভা পাচ্ছিল মেহেদির আলপনা।

ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন হাসিনা-রেহানা। ১৯৭৫ সালের ২৯শে জুলাই শেখ হাসিনা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন ছেলেমেয়েসহ বিদেশে চাকরিরত স্বামীর কাছে যাবেন বলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ ক্লাসের ছাত্রী শেখ হাসিনাকে উপাচার্য ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী ১৫ই আগস্টের পরে জার্মানিতে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু ড. ওয়াজেদের সঙ্গে শেখ হাসিনাকে ২৯শে জুলাই ১৯৭৫ ঢাকা ত্যাগ করতে হয়। রেহানাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। রাসেলেরও জার্মানি যাওয়ার কথা ছিল। ছোটো বলে বেগম মুজিব তাকে ছাড়েননি ।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দিনটি ছিল শুক্রবার। শেখ হাসিনা, স্বামী ডক্টর ওয়াজেদ মিয়া আর বোন শেখ রেহানা সেদিন ব্রাসেলসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের বাড়িতে ছিলেন। তাঁদের ব্রাসেলস থেকে প্যারিস যাওয়ার কথা। ব্রাসেলসের সময় তখন ভোর সাড়ে ছয়টা। সানাউল হকের টেলিফোন বেজে উঠল। সানাউল হকের স্ত্রীর ডাকে ভোর সাড়ে ছয়টায় ওয়াজেদ মিয়ার ঘুম ভাঙল। তিনি জানালেন, জার্মানির বন থেকে সেখানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী টেলিফোনে জরুরি কথা বলতে চান।

মি. চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলার জন্য ওয়াজেদ মিয়া স্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু দুই-এক মিনিট পর শেখ হাসিনা ফিরে স্বামীকে জানান, রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গেই কথা বলতে চান। শেখ হাসিনাকে তখন ভীষণ চিন্তিত এবং উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছিল। টেলিফোন ধরার জন্য ওয়াজেদ মিয়া দ্রুত নীচে নামেন। তখন নীচে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় মাথা নিচু করে পায়চারি করছিলেন সানাউল হক। ওয়াজেদ মিয়া ফোনের রিসিভার ধরতেই অপর প্রান্ত থেকে রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী বলেন, 'আজ ভোরে বাংলাদেশে ক্যু হয়ে গেছে।' টেলিফোনে কথা বলার পর ওয়াজেদ মিয়া উপরে যান। শেখ হাসিনা অশ্রুজড়িত কণ্ঠে ওয়াজেদ মিয়ার কাছে জানতে চান রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে?

ওয়াজেদ মিয়া স্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানান, রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী তাঁদের প্যারিস যাত্রা বাতিল করে সেদিনই জার্মানির বনে ফিরে যেতে বলেছেন। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার জিজ্ঞাসার জবাবে বাধ্য হয়ে ওয়াজেদ মিয়া বলেন, 'বাংলাদেশে কী একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে যার জন্য আমাদের প্যারিস যাওয়া যুক্তিসংগত হবে না।' এ কথা শুনে দুবোন কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁদের কান্নায় ছেলেমেয়েদের ঘুম ভেঙে যায়।

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সালের ঘটনায় শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল মানুষের ঘৃণ্য স্বরূপ। যে মুহূর্তে মি. হক শুনলেন যে সেনা বিদ্রোহে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন, তখনই তাঁর দুই কন্যা এবং জামাতাকে কোনোরকম সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। উপরন্তু নিজের বাসা থেকেও তাঁদের চলে যেতে বলেন মি. হক। জার্মানি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য একটা গাড়ি দিতেও অস্বীকার করেছিলেন তিনি।

তখন হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ফেরেশতার মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের জীবনে। ব্রাসেলস ও জার্মানির বর্ডারে রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী তাঁদের জন্য গাড়ি পাঠালেন। তাঁরা জার্মানির বনে গিয়ে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর বাসায় ওঠেন। তাঁদের আশ্রয় দিতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীকে ঝামেলাও পোহাতে হয়েছে।

সকাল সাড়ে দশটার দিকে তাঁরা ব্রাসেলস ছেড়ে জার্মানির বনের উদ্দেশে রওনা হন। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর বাসায় পৌঁছান তাঁরা। সেদিন বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন যুগোস্লাভিয়া সফর শেষে বাংলাদেশে ফেরার পথে ফ্রাঙ্কফুর্টে যাত্রাবিরতি করেন। রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর বাসায় ওঠেন। ড্রইংরুমে বসে ড. কামাল হোসেন, রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী এবং ওয়াজেদ মিয়া উৎকণ্ঠিত অবস্থায় বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও অন্যান্য রেডিও স্টেশন থেকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

এরই এক ফাঁকে হুমায়ূন রশিদ চৌধুরীকে ঘরের বাইরে নিয়ে ওয়াজেদ মিয়া ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। নিরাপদ স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানাকে কোনো কিছু জানানো হবে না, এই শর্তে রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ওয়াজেদ মিয়াকে বলেন, 'বিবিসি-এর এক ভাষ্যানুসারে রাসেল ও বেগম মুজিব ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই এবং ঢাকাস্থ ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক প্রচারিত এক বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউ বেঁচে নেই।' এই অবস্থায় মি. চৌধুরী মনে করেছিলেন, ভারতে আশ্রয় নেওয়াটাই তাঁদের জন্য নিরাপদ হবে।

সেই বিকেলেই জার্মান সম্প্রচার সংস্থা ডয়েচে ভেলের আর অন্য কয়েকজন জার্মান সাংবাদিক রাষ্ট্রদূতের বাসায় গিয়েছিলেন তাঁর মন্তব্য নেওয়ার জন্য। শেখ হাসিনা আর রেহানা মানসিকভাবে এতটাই বিধ্বস্ত ছিলেন যে তাঁরা কেউই কোনো মন্তব্য করতে চাননি। কারও সঙ্গে কোনো কথাও বলেননি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন রাষ্ট্রদূতের বাসায় উপস্থিত থাকলেও কোনো মন্তব্য

করেননি সেদিন। তবে রাষ্ট্রদূত মি. চৌধুরী সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছিলেন যে, শেখ মুজিবের দুই কন্যা তাঁর কাছেই আছেন।

১৬ই আগস্ট রাত ১১টার দিকে রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী ওয়াজেদ মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যান। উদ্দেশ্য ছিল ওয়াজেদ মিয়াকে ভারতীয় দূতাবাসের এক কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শেখ হাসিনা পরিবারের ভারত যাত্রা নিশ্চিত হয়। সেই কঠিন সময়ে ওয়াজেদ মিয়া, শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানার হাতে কোনো টাকা ছিল না। রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ওয়াজেদ মিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁদের কোনো টাকাপয়সা লাগবে কি না? শেখ হাসিনার সাথে কথা বলে ওয়াজেদ মিয়া জানান, হাজার খানেক জার্মান মুদ্রা দিলেই তাঁরা মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবেন।

এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে করে ২৫শে আগস্ট দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছান শেখ রেহানা, শেখ হাসিনা, ওয়াজেদ মিয়া এবং তাঁদের দুই সন্তান। ভারত সরকারের দুই কর্মকর্তা দুপুরের দিকে তাঁদের বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যান নয়াদিল্লির ডিফেন্স কলোনির একটি বাসায়।

বাড়ির বাইরে না যাওয়া, কারও কাছে তাঁদের পরিচয় না দেওয়া এবং দিল্লির কারও সঙ্গে যোগাযোগ না রাখা– ভারতের কর্মকর্তারা তাঁদের এই তিনটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার নিরাপত্তার জন্য দুজনকে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সত্য ঘোষ নামের এক ইন্সপেক্টর। অন্যজন ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস অফিসার পি কে সেন। এই দুজন অফিসারই ছায়ার মতো শেখ হাসিনার সঙ্গে থাকতেন। শেখ হাসিনার সব খরচ ভারত সরকারই দিত।

একদিন ভারত সরকারের একজন যুগ্মসচিব শেখ হাসিনা এবং ওয়াজেদ মিয়াকে জানান, গুরুত্বপূর্ণ এক সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁদের একটি বিশেষ বাসায় নেওয়া হবে। সেদিন রাত আটটায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে ওয়াজেদ মিয়া এবং শেখ হাসিনা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাসায় পৌঁছান। প্রায় দশ মিনিট পরে ইন্দিরা গান্ধী কক্ষে প্রবেশ করে শেখ হাসিনার পাশে বসেন। ইন্দিরা গান্ধী শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

শেখ হাসিনাকে সান্ত্বনা দেবার সময় ইন্দিরা গান্ধী যে কথাগুলো বলেছিলেন সেটি ওয়াজেদ মিয়া তাঁর বইয়ে বর্ণনা করেছেন এভাবে: 'তুমি যা হারিয়েছো, তা আর কোনোভাবেই পূরণ করা যাবে না। তোমার ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। এখন থেকে তোমার ছেলেকেই তোমার আব্বা এবং মেয়েকে তোমার মা হিসেবে ভাবতে হবে। এছাড়া তোমার ছোটো বোন ও তোমার স্বামী রয়েছে তোমার সঙ্গে। এখন তোমার ছেলেমেয়ে ও বোনকে মানুষ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে। অতএব, এখন তোমার কোনো অবস্থাতেই ভেঙে পড়লে চলবে না।'

১৯৭৫ সালের ৩রা অক্টোবর পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশনের অধীনে আণবিক খনিজ বিভাগে দিল্লিস্থ কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালের ১লা অক্টোবর সাময়িক ও দৈনিক ভিত্তিতে ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশন থেকে তাঁর জন্য একটি পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপের বন্দোবস্ত করা হয়।

শেখ রেহানার সে বছরই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনাবলির জন্য তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনে তাঁর ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়েছিল।

ঐ পর্যায়ে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং তাঁর পরিবার শেখ হাসিনার পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক রাখতেন। শেখ হাসিনার সন্তানদের মাঝে মাঝেই মি. মুখার্জীর সরকারি বাসভবনে খেলতে দেখা যেত।

নিজের বই *ড্রামাটিক ডিকেড*-এ মি. মুখার্জী স্মৃতিচারণ করেছেন যে, 'দুটি পরিবারের মধ্যে মাঝে মাঝে শুধু দেখাই হত না, দিল্লির বাইরে পিকনিকেও যাওয়া হত।'

এরই মধ্যে ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে হেরে গেলেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 'র'-এর কাজকর্মে খুব একটা আগ্রহ দেখাতেন না। ১৯৭৭-এর গোড়ার দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সালে পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়ার পরিবারের ওপর বিভিন্ন ধরনের চাপ ও হয়রানিমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। ডক্টর ওয়াজেদ নিজের ফেলোশিপ এক বছর বাড়ানোর আবেদন করেছিলেন। প্রায় তিন মাস তার কোনো জবাব আসেনি। সে কারণে তাঁকে বেশ আর্থিক সমস্যায়ও পড়তে হয়েছিল। শেষমেশ মোরারজী দেশাই অবশ্য ঠিক এক বছরের জন্য তাঁর ফেলোশিপ বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। ১৯৮০-এর জানুয়ারিতেই ইন্দিরা গান্ধী আবারও ক্ষমতায় ফিরে এসেছিলেন। সেই সাথে শেষ হয়েছিল শেখ হাসিনার সব দুশ্চিন্তা।

বঙ্গবন্ধুর ফুফাতো ভাই মোমিনুল হক খোকার চেষ্টায় লন্ডনে আসেন শেখ রেহানা। ওঠেন তাঁর বাড়িতেই। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রেহানা লন্ডনে আসেন। ভিসা হলেও লন্ডন যাওয়ার একটি টিকিটের জন্যও অনেকের কাছে ধরনা দিতে হয়েছে। একটি টিকিটের পয়সার জন্য অনেককেই অনুরোধ করেছিলেন, চিঠি লিখেছিলেন। বলেছিলেন লন্ডনে গিয়ে চাকরি করে এই টাকা শোধ করে দেবেন। কিন্তু কেউই সাহায্যের হাত বাড়ালেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বলতে হলো বিষয়টি। মিসেস গান্ধীই তাঁর জন্য লন্ডনের একটি বিমান টিকিটের ব্যবস্থা করেন। লন্ডনে এসে তাঁর সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় একটি চাকরি। মরিয়া হয়ে চাকরি খুঁজতে থাকেন। তিনি তখন নিজেই নিজের অভিভাবক। শেখ হাসিনাকে চিঠি লিখে মাঝে মাঝে পরামর্শ নেন।

এমন পর্যায়ে তিনি অনুভব করলেন তাঁর মাথার উপরে একটি ছায়া দরকার। ঠিক তখনই বিয়ের আলাপ আসে। ড. শফিক সিদ্দিক তখন পড়াশোনার জন্য লন্ডনে। শফিক সিদ্দিকের সঙ্গে রেহানার বিয়ের ব্যবস্থা অত্যন্ত গোপনীয়তা এবং দ্রুততার মধ্যে সম্পন্ন হলো। শফিক সিদ্দিক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। তাঁর নানা নামকরা শিক্ষাবিদ জালাল উদ্দিন আহমদ। তিনি ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান তাঁর খালু।

২৪শে জুলাই ১৯৭৭ শেখ রেহানার বিয়ে হয় শফিক সিদ্দিকের সঙ্গে। বিয়েও হয় মোমিনুল হক খোকার বাড়িতে। শফিক সিদ্দিক তখন বিলেতের সাউদাম্পটন ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষারত ছিলেন। বিয়ের পর শফিক সিদ্দিক ও শেখ রেহানাকে নানামুখী

সংকট মোকাবিলা করে অগ্রসর হতে হয়েছে। সে সময় আর্থিক কষ্টটাই ছিল প্রবল। বিয়ের পরপরই স্বামীর সঙ্গে চলে আসেন সাউদাম্পটন ইউনিভার্সিটিতে। শেখ রেহানাও বিভিন্ন জায়গায় চাকরির চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি। এরপরের জীবন সাউদাম্পটন থেকে লন্ডনে প্রত্যাবর্তন।

লন্ডনে এসে স্বামীসহ শেখ রেহানা আবারও উঠেন মোমিনুল হক খোকার বাড়িতে। ইতোমধ্যে তিনি ও শফিক সিদ্দিক অনেক চেষ্টা তদবির করে চাকরি জোটাতে সক্ষম হন। খুঁজে নেন ভাড়ায় হলেও একটা ছোট্ট নীড়। শুরু হয় ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা। একসময় ভাড়া বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে উঠে আসেন তাঁরা। শফিক সিদ্দিক চাকরি করার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার কাজটিও চালিয়ে যেতে থাকেন। শেখ রেহানা চাকরি নেন একটি লাইব্রেরিতে। লন্ডনেই জন্ম হয় ছেলে রাদওয়ান সিদ্দিক ববি ও বড়ো মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের। ছোটো মেয়ে রূপন্তির জন্ম ব্রুনাইতে। ব্রুনাইতে কর্মরত অবস্থায় ভুল চিকিৎসার শিকার হয়ে শফিক সিদ্দিক পঙ্গুত্ব বরণ করে দীর্ঘ কয়েক বছর কর্মজীবন থেকে দূরে ছিলেন।

জীবনযুদ্ধে কিছুটা স্থিত হয়েই শেখ রেহানা শুরু করেন রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রস্তুতি। বড়ো বোন শেখ হাসিনার প্রতিনিধি হয়ে যোগদান করেন সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে অনুষ্ঠিত সর্ব ইউরোপীয় বাকশালের সম্মেলনে ১৯৭৯ সালের ১০ই মে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উত্থাপন করেন পনেরোই আগস্ট নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি। স্টকহোম থেকে ফিরে স্বামী শফিক সিদ্দিককে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলেন সর্ব ইউরোপীয় 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ'। সভাপতি করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বঙ্গবন্ধুর আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম কিউসি এমপিকে। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পিত হয় জাতীয় চার নেতার অন্যতম ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলীর বড়ো ছেলে ড. মোহাম্মদ সেলিমের ওপর। প্রধান পৃষ্ঠপোষক করা হয় শেখ হাসিনাকে। সর্ব ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে ১৯৮০ সালের ১৬ই আগস্ট পূর্ব লন্ডনের ইয়র্ক হলে অনুষ্ঠিত হয় পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহিদদের স্মরণে শোকসভা। এই শোকসভার মাধ্যমেই শেখ হাসিনার অভিষেক হয় পুনরায় সক্রিয় রাজনীতিতে। একই সময়ে গঠিত হয় বঙ্গবন্ধু হত্যা তদন্তে আন্তর্জাতিক কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্যার টমাস উইলিয়াম কিউসি এমপি। সদস্য সচিব হন সলিসিটর অব্রে রোজ। সর্ব ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠনে শেখ রেহানা অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও তিনি আড়ালেই থেকে যান এবং এখনও তিনি আড়াল থেকেই শেখ হাসিনার পাশাপাশি সবক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। ঠিক যেভাবে বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা সবসময় আড়াল থেকেই বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি আমাদের মুক্তিসংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট সব হারিয়ে নিজেদের বেঁচে থাকার ইচ্ছাও হারিয়ে ফেলেছিলেন হাসিনা- রেহানা। তখন বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিল জয় আর পুতুল। সারা দিন বিছানায় পড়ে থাকতেন দুজন, খাওয়াদাওয়া কিছুই করতেন না। জয়-পুতুল যখন কেঁদে উঠত তখন তাঁদের খাবার দিতে স্বাভাবিক হতে হতো তাঁদের। শেখ হাসিনাকে সান্ত্বনা দিতেন রেহানা, রেহানাকে শেখ হাসিনা। এই ছিল তাঁদের অবস্থা।

লন্ডনে এসে রেহানা স্যার থমাস উইলিয়ামের সাক্ষাৎ পান অনেক কষ্টে। উনি তখন রানির কুইন্স কাউন্সিলর হয়ে লর্ডস সভার সদস্য। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে তিনি যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন রেহানা তাঁকে চা-নাশতা খাইয়ে ছিলেন। থমাস উইলিয়ামও তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন। তিনি রেহানার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, দূর থেকে তোমাকে দেখে মনে হয়েছে বেগম মুজিব হেঁটে আসছেন। তিনি সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে জানালেন নিজে থাকতে পারবেন না। কারণ তিনি তখন কুইন্স কাউন্সিলর। দুজন আইনজীবী ঠিক করে দিলেন থমাস উইলিয়াম। আইনজীবীদের ঢাকা যাওয়ার টিকিটের টাকা সংগ্রহ করা হলো প্রবাসী ভাইবোনদের কাছ থেকে। সাধ্যানুযায়ী সবাই দান করলেন এই তহবিলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঢাকা যাওয়া হয়নি এই টিমের। আইনজীবীরা যেদিন ভিসার জন্য হাইকমিশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, সেদিন পুরো হাইকমিশনই বন্ধ করে রাখা হয়। এটি ১৯৭৯ বা ১৯৮০ সালের কথা। এর পরও হতাশ না হয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত ও বিচারের দাবিতে তৎপরতা চালাতে থাকেন শেখ রেহানা।

দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে দেশে ফেরার চিন্তা করছিলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু তখন যারা সরকারে ছিল তারা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানাকে দেশে ফিরতে দিতে চায়নি। এরপর ক্ষমতায় এলো জিয়াউর রহমান। তিনিও খবর পাঠালেন, যেন শেখ হাসিনা বা শেখ রেহানা দেশে না ফেরেন।

ছয় বছর ভারতেই ছিলেন তাঁরা। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি শেখ হাসিনার লন্ডনে যাওয়ার টিকিট আর আবাসনের ব্যবস্থা করে দেন। এরপর সন্তানসম্ভবা বোনকে দেখতে লন্ডনে যান শেখ হাসিনা। এ সময় স্যার উইলিয়াম ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানান। ১৯শে সেপ্টেম্বর লন্ডনের হাউস অব কমন্সের নিকটবর্তী কুন্দুন রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনে স্যার উইলিয়াম বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিশন গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

১৯৮০ সালে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি গিয়েছিলেন। তাঁরা শেখ হাসিনাকে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই তাঁকে সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ আর কোরবান আলীর সাথে ঢাকা রওয়ানা হন শেখ হাসিনা। সামরিক শাসকদের রক্তচক্ষু ও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। ঢাকা বিমানবন্দরে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ সেদিন তাঁকে স্বাগত জানায় সমস্ত ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে স্নেহ-আশীর্বাদে সেদিন সিক্ত করেছিল ঠিকই, কিন্তু যে প্রিয়জনদের তিনি দেশে রেখে গিয়েছিলেন, দেশে ফেরার পর সেই অতি পরিচিত, অতি প্রিয় মুখগুলো আর দেখতে পাননি। পাবেনও না আর কোনো দিন। এরপর থেকে টানা ধরে আছেন আওয়ামী লীগের হাল।

তারপর থেকে বহু টানাপড়েন, বার বার হত্যা চেষ্টা ডিঙিয়ে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। ক্ষমতার পালাবদলও হয়। এখন তিনি চতুর্থবারের মতো সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন। তাঁর জন্মদিনে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

ড. আফরোজা পারভীন : সাহিত্যিক, গবেষক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব, parveenwriter@yahoo.com

শেখ হাসিনার লেখকসত্তা: সুধীজনের অভিমত

রফিকুর রশীদ

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ়প্রত্যয় এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়নের সুকঠিন অঙ্গীকার নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন বিরলপ্রজ লেখক এবং তাঁর মাটিলগ্ন লেখকসত্তার সুস্পষ্ট পরিচয় বছরে বছরে উন্মোচিত ও প্রতিভাত হতে দেখে সামান্য একজন লেখক হিসেবে আমিও প্রবল গৌরব অনুভব করি। টুপিখোলা কুর্নিশ জানাই তাঁর লেখকপ্রতিভা এবং প্রজ্ঞার প্রতি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে লেখক শেখ হাসিনা প্রায় সিকি শতক গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা অনন্য এবং অতুলনীয়। অনতিক্রম্য বললেও বেশি বলা হবে না আশা করি। আমাদের দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে লেখালেখির তেমন প্রবণতা নেই বললেই চলে, পাঠাভ্যাসের ব্যাপারটাও দিনে দিনে তলানিতে ঠেকতে চলেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে একান্ন। এতগুলো বছরে যেসব রাজনীতিক রাষ্ট্র কিংবা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের মধ্যে একমাত্র শেখ হাসিনাই বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন– সুচারুভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে লেখালেখিও অব্যাহত রেখেছেন। একটি-দুটি বই নয়, এ নাগাদ তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় সিকি শতকের কাছাকাছি পৌঁছেছে। শেখ মুজিবের কন্যা তিনি, তাঁর রক্তে মিশে আছে লেখকসত্তার দৃশ্যাতীত প্রবাহ। বাঙালির ন্যায্য দাবি আদায়ের লড়াই এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানের অপরাধে বছরের পর বছর জেল খেটেছেন বঙ্গবন্ধু, জেলখানাতে বসেই লেখালেখি চালিয়ে গেছেন, বিলম্বে হলেও তারই পরিণামে আমরা পেয়েছি অসামান্য তিনটি আকরগ্রন্থ– *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয়াচীন*। এই বইগুলো লেখার সময় যে খাতা ব্যবহৃত হয়েছে, তা জেলখানায় সরবরাহ করেছেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা। আর জেলখানায় এই লেখার খাতা পৌঁছে দেওয়ার সময় মায়ের সঙ্গে একাধিকবার শেখ হাসিনাও গেছেন বাবার কাছে। বাবার ও মায়ের পাঠাভ্যাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছোটোবেলা থেকেই। বড়ো হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে লেখাপড়া করেছেন, ফলে সাহিত্যমনস্ক গভীর অন্তর্দৃষ্টিও গড়ে ওঠে সেই ছাত্রবেলাতেই। কাজেই যে কারও মনে হতেও পারে, শেখ হাসিনার জন্য লেখক হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়, এ যেন বড়োই প্রত্যাশিত ঘটনা।

তবে কি মনেপ্রাণে লেখকই হতে চেয়েছিলেন তিনি? এমন ব্রত কিংবা আকাঙ্ক্ষার কথা তো কোথাও কখনো উচ্চারণ করেছেন বলেও তো জানা যায় না। তবু কীভাবে এলেন এই লেখালেখির পথে? ২০১৮ সালে শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে বাংলা একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'লেখক শেখ হাসিনা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে কবি কামাল চৌধুরী বলেন, 'শেখ হাসিনার মনে সব সময় লেখকসত্তা প্রকাশের আর্তি জাগিয়ে রেখেছিল তাঁর দেশ। তিনি বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, কিন্তু তারও আগে সাহিত্য সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে তাঁকে আমরা জানি তাঁর স্মৃতিকথায়। সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ ও অগ্রসর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা– এ দুইয়ের মিলিত প্রকাশ শেখ হাসিনার লেখকসত্তা, সেই সঙ্গে তাঁর সৃজন ও মননচর্চার অভিজ্ঞান।' সেদিনের অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, 'কোমল-স্নিগ্ধ-পেলব ভাষাভঙ্গিতে তিনি বয়ান করে চলেন তাঁর রচনার এক একটি অক্ষর; পরম মমতায়, সংগ্রামে ও সংকল্পে যেমন রচনা করে চলেছেন বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের সামষ্টিক অগ্রগতির সোনালি স্বপ্ন-অক্ষর।'

শেখ হাসিনার লেখালেখিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমেই আসে আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথা, যেখানে উঠে এসেছে তাঁর গ্রামজীবনের কথা, শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি, পারিবারিক জীবন এবং পিতার অম্লান স্মৃতিচারণ। আর অপর অংশে তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তা ও উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত। তাঁর মানবিক অঙ্গীকার, উপলব্ধির সততা আর প্রকাশভঙ্গির সারল্য একজন সফল রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়কের পাশাপাশি তাঁকে পরিণত করেছে একজন সফল ও দায়বদ্ধ লেখকে। একথা মোটেই অত্যুক্তি নয় যে, এই দেশ এবং দেশের মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব ও প্রবল দায়িত্ববোধই তাঁর লেখকসত্তা প্রকাশের আর্তি জাগিয়ে রাখে সারাক্ষণ।

লেখক শেখ হাসিনার যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত *ওরা টোকাই কেন* গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। এ বইয়ের জন্য অত্যন্ত পরিমিত বাক্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লিখেছিলেন বাঙালি মনীষার উজ্জ্বল প্রতিভূ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। স্বাধীন দেশে নাম-ঠিকানাহারা পথশিশুদের উপেক্ষিত জীবনযাপনের দৃশ্য শেখ হাসিনার সংবেদনকাতর লেখকসত্তায় প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করে, তখনই প্রশ্ন জাগে– 'ওরা টোকাই কেন?' একরাশ স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সিকি শতাব্দীর রাজনৈতিক লড়াইয়ের পর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য

দিয়ে প্রায় ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে স্বাধীন হওয়া হতদরিদ্র এদেশে পরাধীন আমলের মতোই নামহারা পথশিশু বা টোকাইদের দেখে একজন বিবেকবান ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে 'ওরা টোকাই কেন?' বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীন দেশে যে দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেছিলেন, পঁচাত্তরের পর রাজনৈতিক চোরাবালিতে পড়ে সেই মুক্তি আসেনি এটা সহজেই উপলব্ধি করেন শেখ হাসিনা। আর তাই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আনার ব্রত নিয়ে জনগণের কাতারে মিশে গিয়ে এদেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে সচেষ্ট হন এবং এই দেশাত্মবোধই তাঁর লেখকসত্তার উন্মোচন ঘটায়। আমরা পাই লেখক শেখ হাসিনার নব পরিচয়। প্রকাশিত হয় প্রথম বই। এ বই প্রকাশের ত্রিশ বছর পর এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, 'ত্রিশ বছর আগে শেখ হাসিনার প্রথম গ্রন্থ *ওরা টোকাই কেন*-এর ভূমিকা লিখেছিলাম আমি। তখন ভাবিনি রাজনীতির প্রবল দাবি মিটিয়ে তিনি লেখালেখি অব্যাহত রাখতে পারবেন। কিন্তু আমাদের বিস্মিত করে দিয়ে রাজনীতির পাশাপাশি লেখালেখিতেও শেখ হাসিনা সমান সক্রিয়তার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। তাঁর রচনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা বিস্তার এবং গণতন্ত্রের প্রসার ও জনমানুষের সঙ্গে সম্পৃক্তি– এই তিনটি বিষয় মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে ধরা দেয়।'

এক নজরে শেখ হাসিনার গ্রন্থসমূহ

- সাদা কালো
- Democracy in Distress Demeaned Humanity
- আমাদের ছোট রাসেল সোনা
- আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি
- Living In Tears
- রচনাসমগ্র-১
- রচনাসমগ্র-২
- সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র
- Development For The Masses
- Democracy Proverty Elimination and Peace
- বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা
- People And Democracy
- সহে না মানবতার অবমাননা
- ওরা টোকাই কেন
- বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- শেখ মুজিব আমার পিতা
- সবুজ মাঠ পেরিয়ে
- দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা
- বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ
- নির্বাচিত ১০০ ভাষণ
- নির্বাচিত প্রবন্ধ
- The Quest For Vision 2021 - 1st part
- The Quest For Vision 2021 - 2nd part
- Miles to Go: A Collection of Speeches of Prime Minister Sheikh Hasina

দুই খণ্ডে শেখ হাসিনার রচনা সমগ্র প্রকাশিত হলে বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ও বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান 'শেখ হাসিনা ও তাঁর সাহিত্যকর্ম' শীর্ষক নিবন্ধে বাংলার রাজনীতিকদের লেখালেখিতে অনাগ্রহের প্রক্ষাপট তুলে ধরেন এবং এক্ষেত্রে অনন্য ব্যতিক্রম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার লেখালেখির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। সেই নিবন্ধে তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা তাঁর মহান পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াই এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট বাংলাদেশের চার রাষ্ট্রনীতিভিত্তিক মৌলিক সত্তা রক্ষায় যেমন অঙ্গীকারদীপ্ত নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি লেখালেখির মাধ্যমেও তাঁর চিন্তা-চেতনা ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছেন। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের বইপুস্তক পড়া এবং লেখালেখির অভ্যাস নেই বললেই চলে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেক্ষেত্রে আশ্চর্য ব্যতিক্রম। পিতার সেই দুর্লভ গুণ শেখ হাসিনাও যে নিপুণ দক্ষতায় অর্জন করেছেন, বর্তমান রচনাসমগ্র তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শেখ হাসিনা বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হওয়ায় তাঁর গদ্যের বিন্যাসে কিছু পরিশীলনেরও ছাপ আছে। সব চেয়ে বড়ো কথা, বাংলাদেশে এই প্রথম একজন বিপুল জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতার রচনাসমগ্র প্রকাশিত হলো। এক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ হবার গৌরব অর্জন করলেন।'

বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গবেষক ড. আতিউর রহমান 'লেখক শেখ হাসিনা' সম্পর্কে তাঁর লেখা নিবন্ধে শেখ হাসিনার বিভিন্ন রচনার গভীরে দৃষ্টিপাত করেছেন এবং সেসব রচনার সাহিত্যবোধ নিয়ে আলোচনাও করেছেন। তিনি লিখেছেন, "*সবুজ মাঠ পেরিয়ে* শেখ হাসিনার একটি অনন্য সুন্দর সৃষ্টি। এ বইটিতে শেখ হাসিনার সাহিত্যপ্রতিভার সবটুকু নির্যাস অনুভব করা যায়। বইটি তিনি লিখতে শুরু করেছেন ২০০৮ সালে বিশেষ কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায়। ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। বর্ষার পানিতে ঝাঁপিয়ে, শীতের রোদ গায়ে মেখে, ঘাসফুল আর পাতায় পাতায় শিশিরের ঘ্রাণ নিয়ে বেড়ে ওঠে এক কিশোরী। স্মৃতির ডানা মেলে তিনি লিখেন, 'খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সমবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে বেড়ানো, শীতের দিনে নদীর উষ্ণ পানিতে জোড়া নারকেল ভাসিয়ে অথবা কলাগাছ ফেলে সাঁতার কাটা, গামছা বিছিয়ে টেংরা-পুঁটি মাছ ধরা। বর্ষাকালে খালে অনেক কচুরিপানা ভেসে আসত। সেই কচুরিপানা টেনে তুললে তার শেকড় থেকে বেরিয়ে আসত কই আর বাইন মাছ। একবার একটা সাপ দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম।" এইটুকু উদ্ধৃত করে ড. আতিউর রহমান মন্তব্য করেন, এমন বর্ণনা পড়ে যে কেউ ভাবতে পারেন– এ বুঝি কোনো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকেরই লেখা। ১৯৮৮ সালে *সাপ্তাহিক রোববার*-এ যখন *স্মৃতির দখিন দুয়ার* নামে এ লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এমনই মনে হয়েছিল। লেখক হিসেবে নবাগত হলেও শেখ হাসিনা ততদিনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসন রচনা করে নিয়েছেন। শুধু স্মৃতিচারণমূলক লেখাই নয়, তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক লেখাও লেখেন। তাঁর পরিপূর্ণ লেখকসত্তা উন্মোচিত হয় সর্বসমক্ষে। ড. আতিউর রহমান জানান, 'সাহিত্যমানসের জন্য প্রয়োজন কল্পনাশক্তির। সে কল্পনাশক্তি শেখ হাসিনার কী রকম তা *সবুজ মাঠ পেরিয়ে*-এর প্রতিটি লেখাতেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। *সবুজ মাঠ পেরিয়ে*-এর লেখক অনেক পরিণত। বাক্যের গঠন অনেক বদলে গেছে। বেশ শক্ত ও ঋজু। এর মধ্যে লেখকের অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। জীবন ও সমাজ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে। এখন তিনি আরও বেশি পরিপক্ব।'

বড়ো হয়ে ওঠার পর যাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী* তাঁর পঠিত প্রিয় বই, সেই মানুষটির সাহিত্যমানস উপলব্ধি করা যায় সহজেই; তিনি আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর রচনায় একদিকে যেমন *পথের পাঁচালী*র মতোই বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের চালচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে প্রখর রাজনৈতিক চেতনাশাসিত প্রবন্ধগুলোতে পাওয়া যায় এদেশের সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের পরিচয় এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনাগুলোর সুস্পষ্ট পরিচয়। মনে রাখতে হবে, নিছক শখের বশে সাহিত্য রচনা করতে আসেননি শেখ হাসিনা, নিবিড় সাহিত্যপাঠ তাঁকে মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা, প্রত্যাশা-হতাশার অনুভূতিগুলো অনুধাবনে বিরাট সহযোগিতা করেছে; তাই তিনি দেশ ও দেশের মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবার ভাবনা থেকেই তাঁর গভীর বেদনাবোধ থেকে লেখালেখি শুরু করেন। সেই ১৯৮৯ সালে *ওরা টোকাই কেন* গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন, 'গভীর এক বেদনাবোধ থেকে শেখ হাসিনা অবলোকন করেছেন পারিপার্শ্বকে। সেই বেদনাবোধ ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনার অধিকাংশ স্থানে।'

কী সেই বেদনা? বাবা, মা, ভাই ও আত্মীয়স্বজনহারা তিনি এক সর্বহারা। স্বদেশ থেকে মুছে দেওয়া হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর নাম, তাঁর আদর্শ। ছোটো ছোটো দুই সন্তান ঘরে রেখে তিনি পথে পথে ঘুরেছেন সেই আদর্শের খোঁজে। কখনো এক হচ্ছেন স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে, কখনো বন্যাদুর্গত মানুষের সেবায়, কখনোবা পরিচয়হারা পথশিশুদের মানবেতর জীবনযাপন দেখে তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে। সেই সব উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার কথাই তো লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর রচনায়।

বিশিষ্ট কবি ও গবেষক বীরেন মুখার্জী 'শেখ হাসিনার সাহিত্যমানস' শীর্ষক এক প্রবন্ধেও এই বেদনাবোধের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'বিশ্বসাহিত্যে যাদের নাম খ্যাতির শীর্ষে উচ্চারিত হয়, তাদের প্রত্যেকের জীবনেই অপার দুঃখ-কষ্ট-বেদনাবোধের গল্প আছে, আছে জেল-জরিমানা এবং লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার চরমতম ইতিহাস। এমনই এক দিগন্ত বিস্তৃত দুঃখের সমুদ্রে বসবাস করে, ষড়যন্ত্র বিষাদ আর যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি শুধু সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়কই নন, একই সঙ্গে মমতাময়ী এবং সংবেদনশীল লেখকও। সংবেদনশীল মনের অধিকারী হওয়ায় রাষ্ট্র-সমাজ-মানুষ এবং পারিপার্শ্বকে তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করতে পারেন।' এভাবেই রচিত হয় তাঁর লেখকসত্তা। হয়ত মহতের বিনয় প্রকাশ মনে হতে পারে, তবু নিজের লেখকসত্তা নিয়ে একটি বইয়ের ভূমিকায় শেখ হাসিনা যা লিখেছেন, খুবই প্রাসঙ্গিক বলে তা এখানে উল্লেখ করতে চাই। তিনি লিখেছেন, 'কোনোকালে নিজে লিখব, একথা ভাবিনি। সময়ের দাবি আমাকে এখানে দাঁড় করিয়েছে। পিতার স্বপ্ন ছিল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আমি ওই আদর্শ নিয়ে ২৮ বছর যাবৎ জনগণের সেবক হিসেবে রাজনীতি করে যাচ্ছি। চারপাশের দেখা ঘটনা, মানুষের স্বপ্ন ও জীবনকে যেভাবে দেখেছি এবং জেনেছি, তাই লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।'

লেখালেখির মাধ্যম বা উপাদান সম্পর্কে লেখক শেখ হাসিনার এই অকপট ঘোষণা মূলত তাঁর লেখকসত্তায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা এনে দিয়েছে। মানুষটি এমনই, যা বোঝেন তাই সহজে উচ্চারণ করেন এবং লেখালেখিতেও ফুটিয়ে তোলেন। প্রবন্ধ রচনার প্রথাসিদ্ধ নীতিপদ্ধতির বাঁধন আলগা করে তিনি একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়ের বিশ্লেষণমূলক আখ্যান তুলে ধরেন তাঁর প্রবন্ধে, আবার বিনয়ের সঙ্গে বলেন, হয়ত এগুলো প্রবন্ধই হয়ে ওঠেনি।

অথচ প্রথিতযশা পণ্ডিত অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম তাঁর ক্লাসঘরের ছাত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন, 'শেখ হাসিনা সংগতকারণে রাজনীতিক রূপেই অধিকতর পরিচিত, কিন্তু লেখিকারূপেও শেখ হাসিনার অবদান যে উপেক্ষার নয়, তার কারণ তাঁর লেখা কোনো শৌখিন ব্যাপার বা অবসর বিনোদনের জন্য নয়। পঁচাত্তর থেকে পঁচানব্বই তিনি যে দুঃসময় অতিক্রম করেছেন, সে সময় লেখনী ধারণ সহজ ছিল না। তবু যে তিনি না লিখে পারেননি তার কারণ দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, যা তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে এবং পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সম্পৃক্তি থেকে। *শেখ মুজিব আমার পিতা* গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধাবলি, যা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বা সংকলনে প্রকাশ হয়েছিল, তা থেকে একজন গভীর সংবেদনশীল লেখিকার অন্তর্দৃষ্টি এবং সচেতন মনমানসিকতার পরিচয় মেলে, যা গতানুগতিক রাজনৈতিক সাহিত্যে সচরাচর পাওয়া যায় না।'

একথা সত্যি যে, বাংলাদেশের রক্তখচিত বিপদসংকুল রাজনীতির মাঠ থেকে উঠে এসে গণমানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে এবং তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত আছেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে কখনও ক্ষমতার বাইরেও চলে আসতে পারেন, এমনকি চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে মাথা নত করে একদিন তিনি পৃথিবীকে বিদায়ও জানাবেন; কিন্তু তাঁর যা কিছু লেখালেখি তা বাঙালি পাঠকের হৃদয়ের গভীরে টিকে থাকবে দীর্ঘ কালজুড়ে। এখানেই লেখক শেখ হাসিনার জিতে যাওয়া। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের দোলাচালে অনেক সফল রাষ্ট্রনায়কেরও স্থান হয় ইতিহাসের অন্ধকার পর্দার অন্তরালে, কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার লেখকসত্তা ধ্রুবজ্যোতি হয়ে আলো ছড়াতেই থাকবে বাংলার আদিগন্ত আকাশে। আমরা তো জেনেছি দেশের প্রতি দায়বোধ থেকেই জননেত্রী শেখ হাসিনার লেখকসত্তার উদ্‌বোধন ঘটেছে, কাজেই তাঁর সেই অসামান্য লেখকসত্তাই চিরকাল ঘোষণা করবে এই দেশ এবং দেশের মানুষের সত্যিকারে মুক্তির জন্য তাঁর ভাবনা এবং পরিকল্পনা কেমন ছিল, সেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাঁর সরকারের গৃহীত সমূহ পদক্ষেপের কথা বলবে রাষ্ট্র, বৈরী পরিস্থিতির কারণে তা অব্যক্ত থাকতে পারে কিংবা অপব্যাখ্যাও দেওয়া হতে পারে; কিন্তু লেখকের লেখকসত্তা কখনো মিথ্যাচার করে না বলেই তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ অনাগত কালের পাঠকের কাছে সত্যিকারের শেখ হাসিনাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করবে। লেখকসত্তার তো মৃত্যু নেই।

সব শেষে আমাদের ঐকান্তিক কামনা– দীর্ঘায়ু হোন জনগণনন্দিত প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রাজনৈতিক সত্তার পাশাপাশি তাঁর লেখকসত্তারও জয় হোক।

রফিকুর রশীদ: কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ, গাংনী, মেহেরপুর
rafiqurrashid57@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে 'পদ্মা সেতু' উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে পদ্মা সেতু

ইয়াকুব আলী

পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এপি, এএফপি, আল জাজিরা, ভয়েস অব আমেরিকা, ওয়াশিংটন পোস্ট, সিঙ্গাপুরের *স্ট্রেইটস টাইমস*, সৌদি আরবের *সৌদি গেজেট*, *আরব নিউজ*, সংযুক্ত আরব আমিরাতের *খালিজ টাইমস* ও *গালফ নিউজ*, পাকিস্তানের *ডনসহ* প্রতিবেশী দেশসমূহের মূলধারার গণমাধ্যম প্রতিবেদনে পদ্মা সেতু নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে।

আল জাজিরার খবরে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্তাল পদ্মা নদীর উপর একটি যুগান্তকারী সেতু উদ্‌বোধন করেছেন, যা দেশের অনুন্নত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে সংযুক্ত করবে। এযাবৎ বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু যা 'জাতীয় গৌরবের প্রতীক' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সেতুটি বাংলাদেশের মেগা প্রকল্পগুলোর একটি এবং নিজ তহবিল থেকে বাংলাদেশ সরকার সেতু নির্মাণ ব্যয় বাবদ সমস্ত অর্থ জোগান দিয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগের পর ২০১২ সালে বিশ্বব্যাংক ১.২ বিলিয়ন ডলার ঋণচুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। এডিবি ও জাইকাও সরে যায়। হাসিনা, যিনি সেতুটি নির্মাণে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর সরকার এ প্রকল্পে নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন করবে। বহুপাক্ষিক দাতাদের সহায়তা ছাড়া এ ধরনের বিপুলায়তনের অবকাঠামো নির্মাণের কোনো নজির না থাকায় তাঁর এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং দেশের অর্থনীতিবিদদের সংশয়বাদের দিকে ঠেলে দেয়।

আল জাজিরার প্রতিবেদনে পদ্মা সেতুকে 'ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক শফিকুল ইসলামকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, পদ্মা নদীর মাওয়া পয়েন্টে প্রতি ২০ সেকেন্ডে যে পানি প্রবাহিত হয় তা ঢাকা শহরে প্রতিদিন ব্যবহৃত মোট পানির সমান।

নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ব্লুমবার্গের শিরোনাম করা হয়েছে: 'এক দশক আগে বিশ্বব্যাংকের ছেড়ে যাওয়া সেতু উন্মোচন করেছে বাংলাদেশ'। প্রকল্পটিকে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। অরুণ দেবনাথের প্রতিবেদনে বলা হয়, কাজ শুরু হওয়ার আট বছর পর, হাসিনা শনিবার পদ্মা নদীর উপর ছয় কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ সেতুটির উদ্‌বোধন করেন। এটি আট কোটি মানুষকে যুক্ত করবে যারা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক। আরও বলা হয়, পঞ্চাশ বছর আগে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল দারিদ্র্যের সমার্থক। মাথাপিছু জিডিপি ও জেন্ডার ইকুইটির মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে বৃহৎ ও অপেক্ষাকৃত ধনী দেশকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় দক্ষিণ এশীয় এই ক্ষুদ্র দেশটির এখন বন্দনা করা হচ্ছে। ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটবে বাংলাদেশের। দেশটির জিডিপিতে সেতুটি ১ শতাংশের বেশি পয়েন্ট বৃদ্ধি করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। 'যখন আমি আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করি, তখন বাংলাদেশের অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। আমি তাদের ভুল প্রমাণ করেছি,' বুধবার রাজধানী ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আরও বলেন 'দাতাদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ কিছু করতে পারে না এমন ধারণা উবে গেছে।'

বিবিসি বাংলা নিয়মিতভাবে পদ্মা সেতুর ওপর সংবাদ পরিবেশন করেছে। সেতুর বিভিন্ন দিক নিয়েই এসব রিপোর্টে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভয়েস অব আমেরিকার (ভোয়া) খবরে বলা হয়, বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য ঋণপ্রদানকারী সংস্থাগুলো প্রকল্পটি থেকে সরে দাঁড়ানোর পরে নিজস্ব অর্থায়নে সরকার সেতুটি নির্মাণ করে। কানাডার প্রসিকিউটররা শেষ পর্যন্ত কোম্পানির নির্বাহীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে যখন একটি আদালত তাদের বিরুদ্ধে কিছু কথাবার্তার রেকর্ডকে প্রমাণ হিসেবে অগ্রহণযোগ্য বলে রায় দেয়। *ডেইলি স্টারের* সম্পাদক মাহফুজ আনামের মন্তব্যকে উদ্ধৃত করে ভয়েস অব আমেরিকা বলেছে, 'পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে জনসমক্ষে বিশ্বব্যাংকের মতো বহুপক্ষীয় সংস্থাসহ সব দাতাগোষ্ঠীকে আমাদের দৃঢ় মনোবল দেখিয়ে দেওয়া গেল।' আনাম, যিনি হাসিনার কট্টর সমালোচক, লিখেছেন, বহু দেশ তাদের নিজের টাকায় সেতু বানায়। কিন্তু এই সেতু নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, কারণ এর মধ্য দিয়ে দান-খয়রাতের ওপর নির্ভরশীলতার যে ভাবমূর্তি আমাদের ছিল তা চিরতরে মুছে গেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সেতুটি দেশের দারিদ্র্যপীড়িত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সরাসরি প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দলের

রাজনৈতিক সমর্থন বেশি। পদ্মা সেতু এ এলাকার মানুষের ভ্রমণ সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেবে। সেতুটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড তৈরি করেছে এবং বেইজিং এটিকে চীন-বাংলাদেশ সহযোগিতার একটি মাইলফলক হিসেবে দেখে। চীনের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম এটিকে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) অংশ হিসেবে দাবি করার চেষ্টা করেছে, যা বাংলাদেশ সরকার এই সপ্তাহের শুরুতে খারিজ করে দিয়েছে। দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার শক্তিশালী রিজার্ভের কারণে চাঙা বাংলাদেশ সরকার এর আগে সেতু নির্মাণে চীনের ঋণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এপির প্রতিবেদনে ঢাকা থেকে জুলহাস আলম লিখেছেন, চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের সরাসরি অংশ না হলেও, চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিংয়ের বিবৃতির ভাষ্যমতে বেইজিং পদ্মা সেতুকে বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে দেখছে। চায়না রেলওয়ে গ্রুপ বলেছে যে, পদ্মা সেতুতে পরবর্তীতে একটি রেল নেটওয়ার্ক থাকবে যা অন্যান্য বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পের সাথে সংযোগ ঘটাবে এবং এটি চীন এবং প্যান-এশীয় রেল নেটওয়ার্কের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবে কাজ করবে। এপির খবরে আরও বলা হয়, অর্থনীতিবিদরা বলছেন, পদ্মা সেতু বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন প্রতিবছর অতিরিক্ত ১.৩% বৃদ্ধি করবে। যা ৪৬৫ বিলিয়ন ডলার জিডিপির বাংলাদেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে যোগ হবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, ২০২১-২০২২ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৯% এবং ২০২২ সালে তা ৭.১% তে উন্নীত হবে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ্য করা হয়, সেতু নির্মাণে ৪,০০০-এরও বেশি প্রকৌশলী সম্পৃক্ত ছিলেন। নির্মাণে বড়ো প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ ছিল। পানির নীচের পাইলগুলো ১২২ মিটার (৪০০ ফুট) গভীরে প্রোথিত– যা একটি বিশ্ব রেকর্ড। এছাড়া সেতুর জন্য পিলার লেগেছে ৪১টি। পদ্মা সেতু সংশ্লিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগগুলো কানাডার অন্টারিওতে একটি সুপিরিয়র কোর্টে গিয়েছিল, যা ২০১৭ সালে সেতুর নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত একটি আন্তর্জাতিক ঘুষের মামলায় কানাডিয়ান সংস্থা এসএনসি-লাভালিনের তিনজন প্রাক্তন শীর্ষ নির্বাহীকে অভিযোগ থেকে খালাস দেয়।

বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) পরিবেশিত বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *ওয়াশিংটন পোস্ট*। এছাড়াও এপির খবর পরিবেশন করে মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত দৈনিক *খালিজ টাইমস*। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার দেশের দীর্ঘতম সেতুটি উদ্‌বোধন করেছেন। এটি রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মোংলার মধ্যে দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার কমিয়ে দেবে। যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী দৈনিক *ইন্ডিপেনডেন্ট*ও 'বাংলাদেশ দীর্ঘ সেতুর উদ্‌বোধন উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে' শিরোনামে এপির রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে।

আরব নিউজের শিরোনাম করা হয়েছে: 'বাংলাদেশ ৩.৬ বিলিয়ন ডলারে নির্মিত পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন করেছে'। শিহাব সুমন পরিবেশিত সৌদি আরবের ইংরেজি দৈনিক *আরব নিউজের* খবরে বলা হয়, ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পদ্মা সেতু– যা নদীর দুই তীরকে সংযুক্ত করেছে এবং যে নদীর নামে সেতুর নামকরণ করা হয়েছে– ঢাকাকে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে সংযুক্ত করেছে। রাজধানী এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মোংলার মধ্যে দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার কমিয়ে দিয়েছে এই সেতু। ঢাকাভিত্তিক পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুরকে উদ্ধৃত করে বলা হয় যে, দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে যে যাত্রায় দুই থেকে তিন দিন লাগত তা এখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করা যেতে পারে। সেতুটি নির্মাণে আনুমানিক ৩.৬ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে, যা সবই অভ্যন্তরীণ তহবিল থেকে জোগান দেওয়া হয়েছে। 'সেতুটি বাংলাদেশের জনগণের। এটি আমাদের আবেগ, আমাদের সৃজনশীলতা, আমাদের সাহস, আমাদের ধৈর্য এবং আমাদের অধ্যবসায়কে প্রমাণ করে'– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে প্রায় ৩৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মাওয়ায় উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে একথা বলেন। কিছু সংখ্যক বিদেশি প্রকৌশলীসহ ১৪,০০০ এরও বেশি কর্মী এই প্রকল্পে কাজ করেছে। মনসুর আরব নিউজকে বলেছেন যে, সেতুটি বাংলাদেশের জন্য একটি 'আইকনিক বিনিয়োগ' এবং এটি দেশে-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। বিখ্যাত *সৌদি গেজেট*ও পদ্মা সেতুর ছবি দিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

ইন্ডিয়া টুডে-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ পরিণত বয়সে উপনীত হয়েছে। ২৫শে জুন শনিবার পদ্মা নদীর উপর ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক-রেল সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন পরিপক্বতার গল্প হিসেবেই এসেছে।

হার্ষিত সাবরওয়ালের লেখা *হিন্দুস্থান টাইমস*-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারত পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছে। পদ্মা সেতুকে একটি যুগান্তকারী প্রকল্প বলে অভিহিত করেছে। প্রতিবেদনে পদ্মা সেতুর বিস্তারিত বিবরণ উপশিরোনামে উল্লেখ রয়েছে: সেতুটি ঢাকা ও ভারতের কলকাতার মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনবে। *হিন্দুস্থান টাইমস* স্থিরচিত্র ও গ্রাফিক্স দিয়ে ২ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের চমৎকার একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করেছে।

দি হিন্দু পত্রিকার কল্লোল ভট্টাচার্যের রিপোর্টে বলা হয়, পদ্মা সেতু শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগকেই সাহায্য করবে না বরং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও সরবরাহের উন্নতি ঘটাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করে ঢাকায় ভারতের হাইকমিশন বলেছে, 'অবকাঠামো প্রকল্পটি হাসিনার সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে চিত্রিত করে এবং ভারত সব সময় বাংলাদেশের উন্নয়ন উদ্যোগকে সমর্থন করেছে। সেতুটি ভারত এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ– নেপাল ও ভুটানের সাথে দ্রুত পণ্য পরিবহণে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে'। প্রতিবেদনে যোগ করা হয় যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফও মিস হাসিনাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন, 'ভ্রাতৃপ্রতিম বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় সেতুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক'।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন মনোজিৎ মজুমদার। যোগাযোগ, ব্যাবসাবাণিজ্য ও অর্থনীতিতে যে দুর্বার গতি আনবে সে বিষয়ে প্রতিবেদনটিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

নয়াদিল্লিভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া নিউজ এজেন্সি এএনআই পদ্মা সেতুর বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে তাঁর পারিবারিক সুনাম নষ্ট করতে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

এশিয়ান টাইমস-এর সংবাদেও পদ্মা সেতু দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক কী প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

এনডিটিভি'র খবরে বলা হয়েছে, পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন অনেক তাৎপর্য বহন করে কারণ প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পদ্মা সেতু প্রকল্পটি বিভিন্ন প্রকৌশল বিস্ময়ের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ প্রত্যক্ষ করেছে। এটি বাংলাদেশের জন্য বিস্ময়কর কাঠামো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও জ্ঞানের ব্যবহার করা হয়েছে সেতুতে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'এই সেতুটি শুধু ইট, সিমেন্ট, লোহা এবং কংক্রিটের নয় ... এই সেতুটি আমাদের গর্ব, আমাদের সক্ষমতা, আমাদের শক্তি এবং আমাদের মর্যাদার প্রতীক। এই সেতুটি বাংলাদেশের জনগণের।'

পাকিস্তানের *ডন* পত্রিকায় এএফপি পরিবেশিত সংবাদে বাংলাদেশে সেতু উদ্‌বোধনের খবর দিয়ে নির্মাণকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কী কী গুজব ছড়িয়েছিল তারও উল্লেখ করা হয়েছে। এতকিছু সত্ত্বেও ৬.২ কিলোমিটার সড়ক ও রেল সংযোগ সেতুটিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়াদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম যে সেতু নির্মাণ চলাকালে প্রচুর রিপোর্ট করেছে সে বিষয়টিও উল্লেখ্য করা হয়েছে।

উদ্‌বোধনের চমৎকার ছবি দিয়ে এএফপির খবর প্রকাশ করেছে দুবাইভিত্তিক *গালফ নিউজ*।

ব্রুনাই দারুসসালামের জনপ্রিয় ইংরেজি দৈনিক *বোর্নিও বুলেটিন* পরিবেশিত খবরে দেখা যায়, সে দেশে বাংলাদেশ হাইকমিশনে পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান টেলিভিশনে দেখার জন্য বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যরা একত্রিত হয়েছে। শেখ কেটে উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করা হয়। শিলংভিত্তিক ইংরেজি দৈনিক *দি মেঘালয়ান* এ সেতু উদ্‌বোধনের খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে।

কলকাতার *আনন্দবাজার পত্রিকা* পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের দারুণ কভারেজ দিয়েছে। সেতু উদ্‌বোধনের দিনে 'পদ্মা ব্রিজ: আরও কাছাকাছি ঢাকা ও কলকাতা। আজ পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন করবেন শেখ হাসিনা' শিরোনামের একটি ভিডিও ক্লিপ প্রচার করেছে। 'জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়! পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনে হাসিনার কণ্ঠে সুকান্ত' শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়: শনিবার পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কণ্ঠে শোনা গেল সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার লাইন। হাসিনা বলেন, 'কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো অনুযোগ নেই। আমরা নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা দেশবাসীকে নিয়ে সব সমস্যা মোকাবিলা করে যাচ্ছি।' হাসিনা এরপর সুকান্তের কবিতা থেকে দুটি লাইন শোনান, 'জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়। আমরা মাথা নোয়াইনি, আমরা মাথা নোয়াব না। জাতির পিতা আমাদের মাথা নোয়াতে শেখাননি।' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– কলকাতা থেকে বাসে ঢাকায় আসতে হলে কিছু দিন আগে পর্যন্ত পদ্মা পার হতে স্টিমারের প্রয়োজন হতো। কলকাতা থেকে ঢাকার দূরত্ব অন্তত ৫০ শতাংশ কমে যাবে। আগে কলকাতা থেকে ঢাকা ৪০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগত ১০ ঘণ্টা। এখন তা মোটামুটি চার ঘণ্টায় হয়ে যাবে। আর রেলপথে পৌঁছতে সময় লাগবে মোটামুটি সাড়ে ছয় ঘণ্টা। পদ্মা সেতুর ফলে বঙ্গোপসাগর তীরের মোংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব একশো কিলোমিটার কমে যাবে। সংশ্লিষ্ট বন্দর দুটিকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ফলে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ সুগম হবে। পদ্মা সেতু দুদেশের বাণিজ্যেও নতুন সেতুবন্ধ করবে। *আনন্দবাজার পত্রিকা* অনলাইনে পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান সরাসরি প্রচার করেছে। 'পদ্মা ব্রিজ: ১০০ টাকা থেকে ছ হাজার টাকা! পদ্মা সেতু পেরোতে খরচ করতে হবে কত?' শিরোনামে ১৬টি ছবির অসাধারণ একটি ফটোফিচার প্রকাশ করেছে। ফটোফিচারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সব ঠিক থাকলে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শেখ হাসিনা ভারত সফরে যেতে পারেন এই পদ্মা সেতু দিয়েই। *আনন্দবাজার* অনলাইনে ২৭শে জুন 'পদ্মা ব্রিজ: পদ্মা সেতুর নকশা তৈরিতে চারটি সংস্থা! কিন্তু নেপথ্যে কার মস্তিষ্ক' শিরোনামে ২৫টি ছবির আরও একটি ফটোফিচার তৈরি করেছে।

কলকাতার *স্টেটম্যানস পত্রিকা*ও পদ্মা সেতুর ওপর বিশদ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এছাড়া সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত *স্ট্রেইটস টাইমস*, শ্রীলঙ্কা *গার্ডিয়ান* পত্রিকা সচিত্র প্রতিবেদন ছেপেছে।

ইয়াকুব আলী: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রেস অ্যান্ড মিনিস্টিরিয়াল পাবলিসিটি), তথ্য অধিদফতর

'বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট'-এর যাত্রা

অসচ্ছল শিল্পীদের কল্যাণ সাধন, শিল্পীদের কল্যাণার্থে প্রকল্প বাস্তবায়ন, অসুস্থ শিল্পীদের চিকিৎসা সহায়তা, শিল্পকর্মে বিশেষ অবদানের জন্য বৃত্তি প্রদান, শিল্পীদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সহায়তা প্রদান, শিল্পী পরিবারকে সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নবগঠিত দপ্তর-সংস্থা 'বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট'-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। ১১ই আগস্ট রাজধানী ঢাকার বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসে স্থাপিত অস্থায়ী কার্যালয়ে নবগঠিত দপ্তরটির কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারা দেশের সকল ধরনের শিল্পীদের কল্যাণে 'বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট' কাজ করবে। কবি-সাহিত্যিকদের পাশেও এটি দাঁড়াবে। এ ট্রাস্ট শিল্পীদের একটি আশ্রয়ের জায়গা হিসেবে কাজ করবে।

কে এম খালিদ আরও বলেন, শিল্পীরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করেন। করোনাকালে সারা দেশে প্রায় ২০ হাজার অসচ্ছল শিল্পীকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইনের আওতায় দপ্তরটি চালু করার ফলে এ তহবিল আরও বৃদ্ধি করা যাবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলা একাডেমি থেকে অস্থায়ীভাবে দপ্তরটির জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: ঊষা রানি

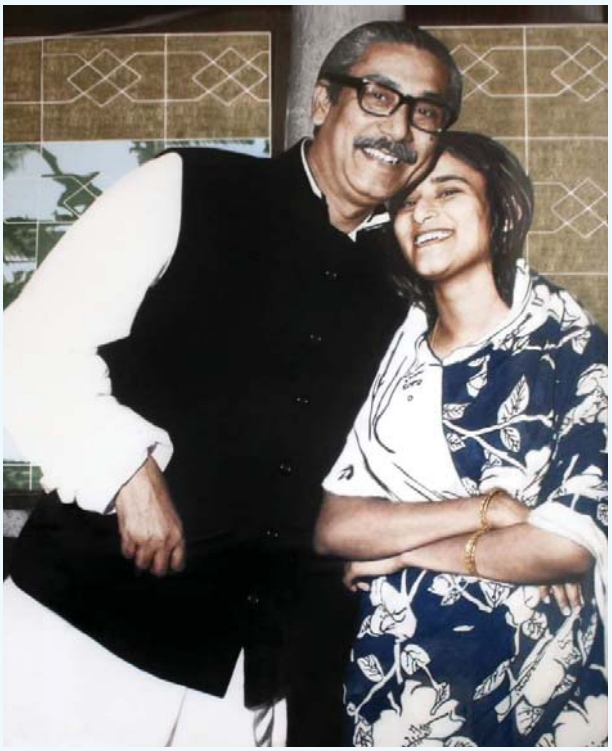

বঙ্গবন্ধুর পর শেখ হাসিনা: নামকরণে মহানুভব

ড. মুহম্মদ মনিরুল হক

মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণের মাত্র কয়েকদিন আগে বোমা মেরে ধ্বংস করেছিল ভৈরব ও আশুগঞ্জ সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে সেতুর কিছু অংশ। ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট এবং ঢাকা-নোয়াখালী যাতায়াতের ঐ সেতুটি 'ভৈরব সেতু' বা 'ভৈরবের মেঘনা পুল' নামে পরিচিত। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ উদ্যোগে এবং যুক্তরাজ্য ও ভারতের আর্থিক সহায়তায় সেতুটি দ্রুত পুনর্নির্মাণ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভৈরব রেল স্টেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা কেটে একটি বিশেষ ট্রেনে চড়ে সেতুটি পার হয়ে আশুগঞ্জ গিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেতুটির নামকরণ করার কথা ছিল 'বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু'। ১৯৭৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পূর্বনির্ধারিত জনসভায় উপস্থিত জনতা সেতুটির নাম বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু করার দাবি জানায়। জনসভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দও মাইকে ঘোষণা করেন, 'বঙ্গবন্ধু সেতুর শুভ উদ্‌বোধন।' পত্রিকার প্রতিবেদন, ব্যানার, ফেস্টুন ও নামফলকেও উল্লেখ করা হয় বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু। কিন্তু সেখানে ঘটে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বাঙালির উদারতার মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনসভায় ঘোষণা করেন, এখন থেকে এ সেতুর নাম হবে– 'শহিদ হাবিলদার আবদুল হালিম সেতু'। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত সেতুর নামটি আজও বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, সেতুটি উদ্‌বোধন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানতে পেরেছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার আবদুল হালিম যুদ্ধরত অবস্থায় ঐ এলাকায় শহিদ হন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা এ সময়ের প্রধান কথক, প্রভাবশালী নিয়ামক, জীবন্ত এক কিংবদন্তি। তাঁর নান্দনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটে কথায়, ব্যবহারে, কালজয়ী সব সিদ্ধান্ত এবং বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে চলায়। দেশের মানুষের ক্ষোভ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, অপমান, জেদ, অহং, সংযম, স্বপ্ন, প্রতিরোধ, সংকল্প– সবকিছুই সমন্বিতভাবে বেজে ওঠে তাঁর আচার-অনুষ্ঠান, চলন-বলন ও কর্মে। তাঁর বিশাল এক হৃদয়। সেই হৃদয়ের কাছে সঞ্চারিত হবার জন্যে লক্ষ-কোটি বাঙালির হৃদয়ের সুর, রং, প্রার্থনা লক্ষ করার মতো। পরিশ্রম, দক্ষতা ও দেশপ্রেম দ্বারা তিনি জনগণের হৃদয়কে প্রতিনিয়ত স্পন্দিত করেন। স্বদেশকে তাঁর মধ্যেই উপলব্ধি করেন এদেশের দেশপ্রেমী মানুষ। বাংলাদেশের মানুষ মনে করে, তিনিই স্বদেশি সমাজের বৃহত্তর ঐক্যের প্রতীক। তিনি স্বদেশের ঘরে ঘরে। স্বদেশের সকল জাতীয় বীরের সাহস ও শৌর্যকে আত্মস্থ করেই তিনি হয়ে উঠেছেন সমাজের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। সর্বক্ষণ তিনি নিজের আত্মবিশ্বাস ও সাহস সকলের মনে সঞ্চারিত করেন। তিনি আত্মবিশ্বাসী বাঙালির অস্তিত্ব, তিনি বাঙালির স্বাতন্ত্র্য ও সাহসের প্রতিনিধি। তিনি স্বভূমিতে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বৈশ্বিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এক আধুনিক মানুষ। বিশ্বের সকল মানবিক উদ্বেগ ঠাঁই করে তাঁর ভেতর। ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য, খ্যাতি বা ক্ষমতা ব্যবহারে তাঁর আগ্রহ নেই। তাঁর রাজনীতির প্রেরণা আসে বঙ্গবন্ধু থেকে, এদেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনা থেকে, আর্থসামাজিক উন্নয়নের চিন্তা-চেতনা থেকে। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে অজস্র দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে, এদেশের খেটে খাওয়া মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে চলেছেন। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সন্তান এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনি সহজ-সাধারণ বাঙালি নারীর মতো বিলাসিতাহীন জীবনযাপন করেন।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে গিয়ে শেখ হাসিনা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেছেন। পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতির অভিযোগ যে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণীত তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশের নিজ অর্থেই পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হবে। শেখ হাসিনা তাঁর উদ্ভাবনী নেতৃত্বের গুণে দেশের জনগণকে আত্মবিশ্বাসী করেছেন এবং দেশি-বিদেশি সকল চক্রান্ত ও সর্বনাশীদের প্রতিহত করে তিনি সফল হয়েছেন, প্রিয় বাংলাদেশকে জয়ী করেছেন। তিনিই বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি বিশ্বব্যাংক ও বিশ্বমোড়লদের চ্যালেঞ্জ করে সফলতা অর্জন করেছেন। শেখ হাসিনার উদ্যোগ, সাহস ও প্রেরণায় দেশের অর্থে ৩০ হাজার কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ২০১১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর করা দুর্নীতির অভিযোগ ২০১৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি কানাডার একটি আদালতে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণীত বলে প্রমাণিত হয়েছে। নিজেদের টাকায়, দেশের টাকায়, দেশের জনগণের টাকায় দেশের বৃহত্তম সেতু তৈরি করার এ সামর্থ্য শুধু অর্থনীতির অঙ্কে সীমাবদ্ধ থাকেনি; সর্বনাশা পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণের এ সক্ষমতা বাংলাদেশের জনগণকে,

বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মকে নতুন করে আত্মবিশ্বাসী করেছে।

বাংলাদেশের অগ্রগতির মহানায়ক শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর উদার নৈতিক আদর্শের ধারক। তাঁর উদারতা হিমালয় পর্বতকেও হার মানায়। তাঁর স্বভাবসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি সর্বজনস্বীকৃত। তিনি বিশ্বমানবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। নিপীড়িত ও বঞ্চিতের জন্য দুঃখবোধ করা, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদী ভূমিকা নেওয়ার গুণাবলিও তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছেন। তিনি মানুষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সদা সচেষ্ট থাকেন। তিনি মনে করেন, এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জনগণের স্বীকৃতিই তাঁর স্বীকৃতি। তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মের প্রতিটি স্তরেই স্থাপন করে যাচ্ছেন উদারতার মহান নিদর্শন। তাঁর উদ্যোগ, পরিশ্রম, মেধা ও প্রেরণায় পদ্মা নদীর উপর নির্মিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সেতু তাঁর নামে করার জন্য আবেদন, নিবেদন, দাবি, প্রস্তাবনা করেছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

প্রথমবারের মতো পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে ৪ঠা জুলাই ২০২২ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়ার পথে পদ্মা সেতুর ওপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পুত্র সজীব আহমেদ ওয়াজেদের সঙ্গে সেলফি তোলেন প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল– পিআইডি

জাতীয় সংসদ অধিবেশনের সদস্যরা এ সেতুর নাম দেশরত্ন শেখ হাসিনা সেতু করার প্রস্তাব করেছেন। এমনকি 'শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু' নাম প্রস্তাব করে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সারসংক্ষেপও প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই সেই প্রস্তাবিত নাম থেকে তাঁর নামের অংশ কেটে দিয়েছেন। মা-বাবা বা পরিবারের কারও নাম না দিয়ে নদীর নামেই এ সেতুর নামকরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সে মোতাবেক ২৯শে মে ২০২২ তারিখে সেতুর নাম 'পদ্মা সেতু' হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

যেখানে বঙ্গবন্ধুর দর্শন বাস্তবায়নের অসমাপ্ত বেদনার অঙ্গীকার, সেখান থেকেই ২৮ বছর বয়সে মা-বাবা-ভাই হারানো শেখ হাসিনার মানব সেবা, উন্নয়ন ও উদারতার সূত্রপাত। ১৯৪৭ থেকে এ পর্যন্ত শেখ হাসিনার জীবন, কর্ম, চিন্তা-চেতনা, দর্শন ও মানসগঠনে রয়েছে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, গভীর অধ্যয়ন, জানা-চেনা-শোনা ও দেখার অন্তর্দৃষ্টি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একদল সামরিক-বেসামরিক ঘাতকচক্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার মাধ্যমে দেশকে নতুন পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, জেল, জুলুম কিছুই বাদ দেয়নি তারা। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র একই চিত্র, একই নির্যাতন, নিষ্পেষণ চালিয়েছিল সামরিক-বেসামরিক ঘাতকচক্র। তাদের প্রধান টার্গেট ছিল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, মুজিবপ্রেমী জনগণ। বঙ্গবন্ধু মুজিবের আত্মীয়স্বজন।

এমনি বিভীষিকাময় বাংলাদেশে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে পা রেখেছিলেন শেখ হাসিনা। শাসকচক্রের ব্যারিকেড ও প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সেদিন গ্রামগঞ্জ, নগর-বন্দর থেকে ছুটে এসেছিলেন লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল জনতা। সেই ঐতিহাসিক ক্ষণে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেছিলেন, 'পিতা-মাতা, ভাই রাসেল সকলকে হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি, আমি আপনাদের মাঝেই তাঁদেরকে ফিরে পেতে চাই। আপনাদের নিয়েই আমি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন করে বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে চাই, বাঙালি জাতির আর্থসামাজিক তথা সার্বিক মুক্তি ছিনিয়ে আনতে চাই।' সেই কঠিন ও বন্ধুর পথ, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ও স্বৈরশাসকের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে শেখ হাসিনা ফেরি করে বেড়িয়েছেন বাংলার গ্রামগঞ্জে, পথে-প্রান্তরে, ফসলের মাঠে, কৃষক-শ্রমিক ও মা-বোনের ঘরে ঘরে। তিনি জেল খেটেছেন, বন্দি জীবন কাটিয়েছেন, বার বার হত্যাকারীদের পরাভূত করেছেন। কিন্তু মনোবল হারাননি, লক্ষ্যে অটুট থেকেছেন। তিনি যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন, সে স্বপ্ন বাংলাদেশের মানুষকেও দেখাতে সক্ষম হয়েছেন এবং একের পর এক সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

শেখ হাসিনা এমন এক রাজনীতিবিদ যিনি সর্বতোভাবে দেশপ্রেমিক। শত ঝড়ঝঞ্ঝা ও ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে তিনি পদ্মাকে করেছেন আশীর্বাদ ও সৌভাগ্যের ঠিকানা। সুযোগ ও যুক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজের নামে পদ্মা সেতুর নামকরণ না করে তিনি যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বঙ্গবন্ধুর পর বাংলাদেশের কোনো সরকারপ্রধানের ইতিহাসে বিরল। বাংলার মানুষও মনে করে এমন মহানুভবতা ও উদারতা শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব, সরল, সহজাত। তিনি দেশের গর্ব, সর্বোত্তম পথনির্দেশক, দেশহিতব্রতী মানবিক রাষ্ট্রনায়ক। যতদিন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে থাকবে দেশ, ততদিন মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাবে প্রিয় বাংলাদেশ।

ড. মুহম্মদ মনিরুল হক: শিক্ষা ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, সহযোগী অধ্যাপক, বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার, dr.mmh.ju@gmail.com

রাজনন্দিনীর মানবিক অভিযান

শাফিকুর রাহী

জগৎ খ্যাত এক রাজা গণমানুষের বিশ্বাস আর গভীর ভালোবাসার অসামান্য মুকুট পড়েছিলেন। সে পদ্ম শোভিত মুকুটে অমরত্বের সোনালি পরশপাথর খচিত মন্ত্রমহিমায় দশদিগন্ত উদ্ভাসিত। রাজার প্রাণের স্বদেশে দীর্ঘজনম ভিনদেশি দানবীয় শাসকগোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন-নিপীড়নে রাজা-রাজার লোকজন অতিষ্ঠ। এমতাবস্থায় দেশের অধিকার বঞ্চিত চরম বৈষম্যের শিকার জনগণের মাঝে নানারকম ক্ষোভের সৃষ্টি হতে থাকে। জনসাধারণ ক্রমাগত ওই বর্গি-দখলদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে রাজার নির্দেশ মতো দীপ্তশপথে এগিয়ে চলার দৃঢ় প্রত্যয়ে অঙ্গীকার করে। শ্যামলিমা স্বদেশের জমিন থেকে এ অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীকে চিরদিনের জন্য তাড়ানোর আন্দোলন সংগ্রামে দেশের সকল শ্রেণি-পেশার লোকজনের অংশগ্রহণে সে দানবীয়গোষ্ঠী টালমাটাল। রাজার সবচে বিশ্বস্ত ও ভালোবাসার মানুষ দেশের গরিব-দুঃখী-মেহনতি কৃষক, শ্রমিক-ছাত্র-শিক্ষক-জনতা। সে মানুষজন রাজার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। রাজা যখন জনমানুষের এমন আবেগীয় আকাঙ্ক্ষার অনল অনুভব করতে পারলেন, তিনি ধীরে ধীরে আরও কঠিন ও কঠোর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিলেন, যা কি না স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার বৃহত্তর জনসংগ্রামে ধাবিত হতে লাগল রাজার প্রবল প্রতাপ, দূরদর্শী প্রাজ্ঞ, রাজনৈতিক নেতৃত্বে গণমানুষের মুক্তির পথ তরান্বিত হলো।

রাজা জনগণের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে জ্বালাময়ী বক্তৃতা-ভাষণ দিতে শুরু করলেন, সকল স্তরের মানুষজনকে সচেতন হওয়ারও আহ্বান জানান। আপামর জনতার দেওয়া পরম ভালোবাসার রাজমুকুটের মূল্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে শুধু উপলব্ধিই করলেন না, তা সম্পূর্ণভাবে পালন ও বাস্তবায়নে এগিয়ে চললেন সামরিক স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তাঁর উদারতা ও মানবিক গুণাবলির অনন্য সাধারণ কর্মপ্রয়াসে সে রাজ্যের সকল ধর্ম-বর্ণের, রাজনীতির সকল মত ও পথের মানুষজনও বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে উজ্জীবিত ও মুগ্ধ। এমতাবস্থায় দেশের কোটি কোটি জনতা রাজার ডাকে সাড়া দিয়ে ওই দখলদারের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করল। আর তখনই শুরু হয় রাজার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র। অন্যায়ভাবে রাজাকে গ্রেপ্তার করে আজ এ কারাগারে তো কাল অন্য কারাগারে বন্দি করে রাখে। ভিনদেশি দস্যুদের এসব অন্যায়-অত্যাচার-নির্যাতনে দেশের প্রজারা ধীরে ধীরে জাগতে শুরু করলেন। তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে রাজার মুক্তির দাবি নিয়ে রাজপথ কম্পিত করতে লাগল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখরিত হলো শহর-নগর-গাঁয়ের সমস্ত জনপদ। জনগণের দাবির মুখে রাজাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো ওই স্বৈরশাসক। বর্গি-দখলদার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে বেহুঁশ, মাতালপ্রায় দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার হরণের চক্রান্তে।

রাজার দেশের মেহনতি দুঃখী মানুষের অংশগ্রহণের সঙ্গে শুরু থেকে ছিল দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকসহ নানা শ্রেণি-পেশার লোকজন। বিচক্ষণ রাজা চিন্তা করলেন, তিনি শুধু এ মানবতা বিবর্জিত অপশক্তির সঙ্গে একা লড়াই করে জয়ী হতে পারবেন না হয়ত। তাহলে কী করতে হবে; বহির্বিশ্বের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এ ভাবনা থেকে রাজা বিদেশ ভ্রমণের কৌশল অবলম্বন করলেন। সুযোগ পেলেই তিনি ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এ বিষয়টিও ওই বর্গি শাসক কীভাবে যেন টের পেয়ে গেল। সে কারণে গণদুশমন রাজার পেছনে সাদা পোশাকের গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়ে দিলো। সেসব গোপন সংস্থার লোকজন রাজার পেছন পেছন ছুটে বেড়ায়, তিনি কোথায় যান, কী করেন এসব খবর সংগ্রহ করে। আর গণমানুষের রাজার ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে সমগ্র দেশজুড়ে সে শাসকগোষ্ঠীর অমানবিক অত্যাচারের খবর রটে যায়। তারই ধারাবাহিকতায় অধিকার বঞ্চিত পীড়িত মানুষজন রাজার পক্ষে ন্যায়নীতির আন্দোলন সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ওই ভিনদেশি বেনিয়া জনগণের ওপর নানা বৈষম্যের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে রাজার নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণমানুষ প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এমন অযাচিত পীড়নের বিরুদ্ধে জনগণ আবারও জেগে উঠতে শুরু করলে মুক্তিকামী জনতার ওপরও অত্যাচারের খড়্গ হাকায় দখলদার শাসকগোষ্ঠী। রাজা কিন্তু দমে যাওয়ার মানুষ নয়, দেশে ন্যায়নীতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জীবন বাজি সংগ্রামে রাজার প্রতিজ্ঞা অব্যাহত থাকে। এমনিভাবে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণকে নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সাধারণ মানুষ ভাবতে শুরু করলেন যে, আমাগো দেশেতো আগে এমন জনদরদি কোনো মহান মানুষের কথা আমরা শুনিনি কখনো। সকল মেহনতি দুঃখীজনের মুখে মুখে এ মহান নেতার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রাজার সব ভাবনায়-চিন্তায় অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আরও প্রবলভাবে সঞ্চারিত হলো। এমন সব ভাবতে গিয়ে রাজা তাঁর নিজের ঘরসংসারের ভালোমন্দ দেখাশোনার কথাও এক সময় ভুলে যায়। সে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে নানা দাবিদাওয়া নিয়ে মানুষজন সোচ্চার হতে লাগল। ভিনদেশি অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী জনগণের ন্যায্য অধিকার হরণে পেশিশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কোথাও কোথাও মিটিং-মিছিলে গুলি চালিয়ে আন্দোলনকে স্তব্ধ করার চক্রান্তের নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে মুক্তিকামী মানুষ হত্যার মাধ্যমে।

রাজাকে অন্যায়ভাবে বছরের পর বছর অন্ধ সেলে বন্দি করে রাখে স্বৈরশাসকগোষ্ঠী। রাজার সঙ্গে কারাগারে বন্দি করা হয় হাজার হাজার নেতাকর্মীদের। রাজা জেলে বসে এসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার হুকুম দিলেন। এ অন্যায়-অবিচার বরদাস্ত করা যায় না। তোমরা যে যেভাবে পারো আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাও। রাজার বীরত্বপূর্ণ নির্দেশে সর্বত্র গণজাগরণ সৃষ্টি হলো। সাধারণ মানুষজনের নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার খবর ভিনদেশি স্বৈরশাসকগোষ্ঠী টের পেয়ে যায়। এভাবে দেশের জনগণের ওপর অত্যাচার-অবিচার করে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকা যাবে না। শাসকশ্রেণি নতুন খেলায়

মেতে ওঠে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ভয়ানক ষড়যন্ত্রের জালে আটকাবে রাজাকে। এমনই এক মুহূর্তে রাজার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলো যা সম্পূর্ণ মিথ্যে। মামলার রায়ে রাজার ফাঁসির আদেশ হওয়ার খবর রটে যায় সমগ্র দুনিয়াজুড়ে। রাজার প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের গভীর ভালোবাসা আরও তীব্র হলো। কোটি কোটি জনতা শপথ নিলো রাজাকে এ মিথ্যে মামলা থেকে মুক্ত করব, এতে মরতে হলে মরব, রাজাকে মুক্ত করে আনব। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হলো তাবৎ লোকালয়। সচেতন নাগরিক সমাজের দ্রোহী কণ্ঠস্বরে আকাশ-বাতাস কম্পমান। সংগ্রামমুখর জনতার মুখে বার বার উচ্চারিত হতে লাগল– আমাদের দাবি মানতে হবে, না হয় গদি ছাড়তে হবে!

গণদাবি জনবিস্ফোরণে পরিণত হলো। সকল বাধার আঁধার ভেঙে প্রজ্বলিত হলো। সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল জেলের তালা ভাঙব; রাজাকে আমরা মুক্ত করে আনব। ভিনদেশি বর্গি-দখলদার জনগণের প্রিয় রাজাকে নানাভাবে ফাঁসাতে গিয়ে শেষমেষ তারা নিজেরাই নিজেদের ফাঁদে আটকা পড়ে। জনবিস্ফোরণের ফলে রাজাকে ক্ষমতাসীন স্বৈরশাসক মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। রাজা মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর ভক্ত-অনুরাগীরা দেশের সমস্ত জনগণের পক্ষ থেকে বিশাল জনসমাবেশের মধ্যদিয়ে রাজাকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাধিতে উদ্ভাসিত করলে রাজা ওই মুহূর্তে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন– 'আমি তোমাদের এই পরম ভালোবাসা বিশ্বাসের অমূল্য-মূল্য যে করেই হোক পরিশোধ করবো ইনশাল্লাহ'। সেদিন থেকে রাজার শক্তি-সাহস শতগুণ বেড়ে যায়। তিনি ভাবেন এ অবহেলিত জনপদের অধিকার বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষের জীবনমান উন্নত করার জন্য যা যা দরকার আমি তাই-ই করার চেষ্টা করব। রাজা মনেপ্রাণে এদেশের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক মুক্তি না আসা পর্যন্ত আমি আর ঘরে ফিরব না বলে জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। রাজা এটাও বললেন যে, আমি এও জানি, জবান বরখেলাফকারীকে মহান সৃষ্টিকর্তাও পছন্দ করেন না। আমি তোমাদের আমূল মুক্তির জন্য জীবন দিতেও রাজি। তোমাদের সকল ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আমি সে অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে জীবন দিতেও প্রস্তুত। জনগণ রাজার এমন অসাধারণ কথা শোনার পর তাদের সকলের মলিন অবয়বে আনন্দের ঝরনাধারা বয়। তারাও শপথবাক্য পাঠ করে– এমন মানবদরদি রাজার নির্দেশে আমরা সবাই প্রাণ উৎসর্গ করব। রাজার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ইতোমধ্যে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছে, কেউ আহত অবস্থায় মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। জনদরদি রাজার মন ভালো নেই, কীভাবে এ সংকট থেকে জাতিকে উদ্ধার করা যায়! এভাবে বহুদিন ধরে রাজা নানামাত্রিক জনকল্যাণমুখী কর্মপ্রয়াসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রথমেই রাজা দেশের জনগণকে জাগ্রত করেন ঐক্যবদ্ধভাবে শাসকগোষ্ঠীর সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করতে হবে; পাশাপাশি গণমানুষের রায় প্রমাণিত করতে হলে দরকার ভোটযুদ্ধে অংশগ্রহণের। যার মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। রাজার যে কথা সে কাজ, শুরু হলো নির্বাচনের প্রস্তুতি। বর্গি শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-অত্যাচার, বিপজ্জনক বৈষম্যের কবল থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে হলে নির্বাচনই একমাত্র পথ বলে রাজা ঘোষণা দিলেন। সে ঘোষণা অনুযায়ী সঠিক সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সে নির্বাচনে রাজা বিপুল ভোটে জয় লাভ করেন। দেশ-বিদেশের বিবেকবান সব মানুষজন রাজাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠায়, দেশের সর্বস্তরের মানুষের মনে আনন্দধারা বয়। কিন্তু সে বর্গি-দানবীয় শাসকগোষ্ঠী রাজার এ বিপুল বিজয়কে মেনে নিতে চায় না বিধায় দেশের জনগণ তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধে অংশ নিতে শুরু করে। দেশ উত্তাল জনরোশে ফুঁসে ওঠে অবৈধ সামরিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। দখলদার স্বৈরশাসক ন্যায়নীতি মানে না, পেশিশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদ দখল করে রাখতে চায়। এমন সব কর্মকাণ্ডে রাজার নির্দেশে লাখো জনতা রাজপথে নেমে পড়ে। আন্দোলন সংগ্রামে কম্পমান ভিনদেশি বর্গি-দুশমন মানুষ হত্যায় মেতে ওঠে। বিচক্ষণ রাজার আদেশ পেয়ে জনগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে বেধে যায় তুমুল লড়াই। ভিনদেশি শ্বাপদ-শয়তান ঘুমন্ত নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দত্যিদানব রূপে শুরু করে গণহত্যা। রাজার লোকজনও পিছু হটার মানুষ নয়। রাজার জন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত। সাধারণ মানুষজন গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে পাশের দেশে পাড়ি জমায়। ধীরে ধীরে দেশের সবকটি জনপদ দখলে নিতে সক্ষম হয়। শুরু হয় সম্মুখ যুদ্ধ, বর্গি-দস্যুদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞে কেঁপে ওঠে তৃতীয় আকাশ। বিশ্ববাসী বিস্মিত গণহত্যার ভয়ংকর তাণ্ডবে।

বীর গেরিলাও মরণপণ যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে রুখে দাঁড়াতে সক্ষমতা অর্জন করার ফলে যুদ্ধবাজ সশস্ত্র সন্ত্রাসী শাসকগোষ্ঠী পিছু হটতে বাধ্য হয়। মুক্তিকামী জনতা ও মিত্রবাহিনী জলপথ-স্থলপথ-আকাশপথে আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি করলে শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে। মাটি ও মানুষের দুশমন শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য হলে শত্রু মুক্ত আকাশে-বাতাসে স্বপ্নের সোনালি পায়রা উড়ে। দশদিগন্ত প্রকম্পিত হলো মুক্তিকামী জনতার আনন্দ উল্লাস ধ্বনিতে। সে আদিম বর্বর হায়েনা রাজার দেশের গ্রামগঞ্জ-শহর-নগরের সব বাড়িঘর-জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে লাখো লাখো মুক্তিকামী মানুষ শহিদ হওয়ার খবর রটে যায় বিশ্বব্যাপী। সম্ভ্রম হারিয়েছেন লাখো মা-বোন। এসব খবর রাজা জানে না, কারণ সম্মুখ সমরে রাজাকে বন্দি করে রাখে ওই যুদ্ধবাজ সামরিক হন্তারক অন্ধকার কারাগারে। রাজার বিরুদ্ধে অন্যায় অলীক অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে রাজাকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। রাজা কিছুতেই মাথা নত করবে না, শত্রুর সঙ্গে কোনো আপোশ রাজা মানতে ভীষণ নারাজ। কেননা রাজার দেশের জনগণের আত্মমর্যাদার কথা চিন্তা করে রাজা সবসময় নীতিতে অটল অভয় থেকেছেন, বীরত্বের গর্বিত গরিমায় ছিলেন প্রজ্বলিত। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক চাপে রাজাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সে মানবতার দুশমন যুদ্ধবাজ সামরিক শাসকগোষ্ঠী।

রাজার দেশের মুক্তিকামী জনতা তখনও জানে না ভিনদেশের বন্দিশালায় রাজা বেঁচে আছেন কি না। পূর্ব দিগন্তে রক্তরঙিন অরুণ প্রভায় মহা আনন্দে বিচ্ছুরণ ছড়ায় আর অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানায় দেশের জন্য আত্মদানকারী শহিদদের অম্লান স্মৃতির প্রতি। দেশের সর্বস্তরের জণসাধারণ শঙ্কিত, রাজার উপস্থিতির অপেক্ষায় সংকট সন্ধিক্ষণে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। কবে আসবে রাজা, তাঁর চির স্বপ্নের লালিত স্বাধীন মুক্ত আলো বাতাসে? জনতার এমন উৎকণ্ঠা উদ্বেগের দুর্বিষহ দুর্গতির ভয়ানক শঙ্কায় অমানিশার কাল কেটে পরম ভালোবাসার বরপুত্র ভিনদেশি বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেয়ে বিশ্ববীরের আগমনী বার্তায় নেচে ওঠে সুনীল সমুদ্রের তরঙ্গমালা। বাধার ভয়ানক আঁধার ভেঙে আনন্দ ঊর্মিমালায় স্বাগত জানায় তেরোশত নদীর জলধারায়। বৃক্ষের ডালে বসন্ত বাতাসে কোকিলার মনমাতানো সংগীতের তালে তালে কোটি মানুষের মলিন অবয়বে ফুটে ওঠে গোলাপিত হাসি। রাজাকে কাছে পেয়ে আনন্দ অশ্রুতে ভাসমান রক্তাক্ত শ্যামল কোমল সমগ্র লোকালয়। সকল মানুষের মনে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির অফুরান আনন্দ সংগীত বেজে ওঠে– 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি'। রাজা লাখো প্রাণের রক্তেভেজা পবিত্র জমিন স্পর্শ করেই আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে দুচোখে বয় স্বজনহারার শ্রাবণধারা। রাজার শুভ আগমনে লাখো জনতার গগনবিদারি স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত দশদিগন্ত।

আনন্দ-বেদনার মর্মবাণী বাজে নদীর কলতানে বাতাসের কানে। রাজার শতজনমের স্বপ্নসাধনার সাফল্যের অবিস্মরণীয় বাণী বেজে ওঠে শ্যামলিমা বীর জননীর স্বাপ্নিক মনোলোকে। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন হাজার বছরের লাঞ্ছিত বঞ্চিত অধিকারহারা অসহায় মানুষের অপরিসীম আত্মত্যাগে উদ্ভাসিত সুবর্ণ ভূমিতে কোনো মানুষ আর কখনো বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হবে না। মানবতার মুক্তির জয়গানে আমরা এ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে আপন আলোয় গড়ে তুলবো ইনশাল্লাহ। কিন্তু ভায়েরা আমার আপনারা মনে রাখবেন স্বাধীনতা পাওয়া থেকে তা রক্ষা করা অনেক কঠিন। এ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে আপনাদের সকলকে দেশ গঠনের কাজে শপথ নিতে হবে। আমাদের নাগরিকদের সব ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে, কর্ম কৌশল প্রণয়নের মধ্য দিয়ে আমরা প্রিয় স্বদেশের মাটি থেকে ক্ষুধা-দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অন্যায়-অবিচার দূর করব সকলের আপ্রাণ প্রচেষ্টায়। এমনিভাবে রাজা দেশ বিনির্মাণে অতন্দ্রপ্রহরী বেশে দিন-রাত কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। স্বপ্ন সম্ভাবনার আলোয় উন্নয়ন সাফল্যের ধারাবাহিকতায় দেশ এগিয়ে চলার মাঝপথে আচমকা অশুভ বিপদ সংকেত। এক গভীর রাতে রাজা আক্রান্ত হলো দেশীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কঠিন চক্রান্তে।

তাঁর প্রিয় দেশের প্রাণের স্বজনরা কেউ টের পেলেন না, গণমানুষের ভালোবাসার মুকুট পড়া সোনালি পরশপাথর হারিয়ে গেল। বিশ্ব মানবতার মুক্তিপ্রাণ পুরুষকে হারিয়ে শোকে স্তম্ভিত সমস্ত গৃহলোক, নিদারুণ শোকানলে দগ্ধপ্রাণ বিশ্ববিধাতার মনোমন্দিরে ব্যাকুল আরাধনায় নিমগ্ন। সে নির্মম সন্তাপের দাবানলে বাক্‌রুদ্ধ বিশ্ববিবেক। এমন জনপ্রিয় মহান মানবিক নেতাকে কী কারণে সপরিবার প্রাণ দিতে হলো? মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বরোচিত্তো হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত নিপীড়িত জনতার প্রাণের পরম আপনজন। প্রাণপ্রিয় রাজার জনগণের বুকভাঙা মাতমে সমুদ্রের ঊর্মিমালা থমকে দাঁড়ায়; গতিহারা প্রগতির সোনালি সাম্পান দিশেহারা। সে চক্রান্তকারী বিশ্বাসঘাতকের হিংস্র থাবা থেকে নিরপরাধ নারী-শিশু কেউই রেহাই পায়নি। জাতিঘাতক জঘন্য দস্যুদের ভয়াবহ আক্রোশে রাজার প্রিয় মানুষজনকে নির্দয় নিঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ভিনদেশে বেড়াতে গিয়ে সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যায় রাজনন্দিনী ও তাঁর ছোটো বোন। তাঁরা ভিনদেশের মাটিতে প্রাণের সকল স্বজনহারার দুসংবাদ শোনা মাত্র দুজনই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে; এমন দুর্ভাবনায় হতবিহ্বল, জগতের সব কিছু অচেনা বলে মনে হয়, বার বার মূর্ছা যায় রাজনন্দিনী।

রাজনন্দিনী প্রতিজ্ঞা করলেন মা-বাবার অসামান্য আত্মত্যাগে রচিত মুক্ত আলো-বাতাসে তিনি ফিরে যাবেন।

রাজনন্দিনীকে বরণের ফুলেল ডালা মুহূর্তে ভেসে যায় লাখো মানুষের চোখের জলে আর মেঘভাঙা বর্ষণের জলধারায়। তিনি লাখো লাখো মানুষের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পেয়ে শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করলেন। রাজনন্দিনী আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন– আজ আমি আপনাদের মাঝে আমার বাবা-মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি। আপনারা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে আমাকে সহযোগিতা করেন তবে আমি রাজার হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব ইনশাল্লাহ। রাজনন্দিনী রাজার রক্তেভেজা সুবর্ণভূমি স্পর্শ করে দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করলেন। আপনাদের অনেক ত্যাগ শিকার করতে হবে, তাহলেই আমরা রাজার মহান আদর্শ বাস্তবায়নে সফল হব। রাজনন্দিনীর এমন মানবিক মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠস্বরে রাজার ভক্ত-অনুরাগী সচেতন নাগরিকসমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল। তারাও দৃঢ়কণ্ঠে শপথ নিয়ে রাজার আদর্শ ও চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামে রাজনন্দিনীর মানবিক অভিযানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জানান দিলেন– কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ জানে না দেশপ্রেমী জনতা।

এসব মানবিক অভিযান চালাতে গিয়ে রাজনন্দিনীর জীবনের ওপর হুমকি আসে; তিনি দুঃসাহসী কণ্ঠে হুঁশিয়ার উচ্চারণ করে বলেন, জীবন থাকলে মৃত্যু আসবে। আমি আমার পিতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব, মরতে হলে মরব তবু আমি এ দেশের মেহনতি দুঃখী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। তিনি মৃত্যু ভয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, মানবতার মুক্তির সংগ্রাম আমি চালিয়ে যাবো। এরই মাঝে রাজনন্দিনীকে দেশীয়-আন্তর্জাতিকভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র চলে। তাঁকে বার বার হত্যার চক্রান্ত করে দেশদ্রোহী মানবতাবিরোধী খুনিচক্র। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত মানবতাবিবর্জিত গণদুশমনদের বিরুদ্ধে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বললেন, দেশে আর কোনো দেশদ্রোহীদের সন্ত্রাসী অপতৎপরতা চালাতে দেওয়া হবে না। যে-কোনো শক্তিধর চক্রান্তকারী হোক না কেন তাদের কঠিন হস্তে দমন করা হবে। সে ঘাতকদের সব ষড়যন্ত্রকে দুঃসাহসী মনোবলে নস্যাৎ করে দিয়েছেন রাজনন্দিনী। তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মেহনতি মানুষের মলিন অবয়বে হাসির গোলাপ ফোটাতে দৃঢ় অঙ্গীকার করেন। জনমানুষও তাঁর বীরত্বপূর্ণ মর্মগাথায় স্বাগত জানায়। তাঁর মানবিক অভিযানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজার ভক্ত লোকজন রাজনন্দিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে দেশদ্রোহী স্বৈরশাসকগোষ্ঠী পরাজিত হতে বাধ্য হয়।

তিনি দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম রহমতে প্রাণে বেঁচে যান। তাঁর অপরিসীম পরিশ্রম কর্মসাধনের ক্ষমতা বিশ্ববিধাতা দিয়েছিলেন বলেই তো আজ তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভরশীল ও জনপ্রিয় নেতার খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারপ্রধান হিসেবে তাঁর যশখ্যাতি সাম্য ও সম্প্রীতির দ্যুতি ছড়ায় সমগ্র লোকালয়ে। তিনি তাঁর পিতার রেখে যাওয়া স্বাধীন সার্বভৌম দেশকে মর্যাদাশীল রাষ্ট্রের তালিকায় প্রতিস্থাপনে সক্ষমতা অর্জন করেছেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। আজ তিনি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বি নেতার আসন অলংকৃত করার মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশবাসীকে করেছেন সম্মানিত। তাঁর অপ্রতিরোধ্য মানবিক অভিযানে বিস্মিত বিশ্ববিবেক। সফলতার ধারাবাহিকতায় গৌরবদীপ্ত ইতিহাস রচনা করে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশের বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন বার বার। তিনি এখন সমগ্র দুনিয়ার পীড়িত জনতার আপন ঠিকানায় উদ্ভাসিত মানবিক নেতা। তাঁর মননশীল মনোলোক ধারণ করে মানবসভ্যতার বিকাশ সাধনের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের এক সৌহার্দ্যপূর্ণ মানবিক ভূগোল। তিনি দেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থীকে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদানের এক বৈপ্লবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যাতে করে আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জ্ঞানে-মানে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

রাজনন্দিনী ইতোমধ্যেই শত বছরের ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের মহাপরিকল্পনা নিয়েছেন, যাতে করে বোঝা যাবে একশত বছর পর এদেশের রূপরেখা কেমন হয় কিংবা দেশের মান-মর্যাদা কতটা উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধশালী হবে। আজ দেশে ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়েই চলেছে, তার পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলছে রাজনন্দিনীর বিচক্ষণতা ও প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক দূরদর্শী চিন্তা-চেতনায়। তিনি গণমানুষের পরম ভালোবাসা আর বিশ্বাসের অমূল্য অবদানের ফলে আজ বিশ্বনেতার অসামান্য খ্যাতির অরুণিমা আভায় বিকশিত। দেশ গঠনে তাঁর গৌরবদীপ্ত ইতিহাস বিশ্ববাসীকে করেছে বিস্মিত, দেশের সাধারণ মানুষকে করেছে আন্দোলিত ও আলোকিত। এভাবেই রাজার রক্তেভেজা পবিত্র জমিন আর মানুষ জেগে ওঠে রাজনন্দিনীর মানবিক অভিযানে। আপনার শুভ জন্মদিনে বিপ্লবী অভিনন্দন, আরও দীর্ঘ হোক আপনার পথচলা।

শাফিকুর রাহী: কবি, সাংবাদিক, ক্ষুদ্রপ্রাণ মুজিবপ্রেমী

পদ্মা সেতু: দক্ষিণী উন্নয়নের সোনালি দরজা

জাকির হোসেন

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের উন্নতির পেছনে বিভিন্ন সূচক কাজ করেছে। যেমন– মধ্য প্রাচ্যের উন্নয়নে খনিজ তৈল, ইউরোপের উন্নয়নে খনিজ পদার্থ, শিল্পবিপ্লবের সূতিকাগার ও বিভিন্ন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে আহরিত মতান্তরে শোষণকৃত সম্পদ ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতিতে না আছে খনিজ, না আছে কোনো লুণ্ঠিত অর্থ। তবে বাংলাদেশের রয়েছে ষোলো কোটি মানুষের বত্রিশ কোটি হাত আর একজন রাষ্ট্রনায়কের সুদৃঢ় সংকল্প।

বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল এই আওয়ামী লীগ। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি বেশ কিছু মেগা প্রকল্প হাতে নেয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো– 'পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প'। এটি বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি স্বপ্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। আর এ স্বপ্নের রূপকার বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের ভেতরে এবং বাইরে বহু ব্যক্তির নানা ষড়যন্ত্রের ফলে এবং তথাকথিত কিংবা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিশ্বব্যাংক ২৯শে জুন ২০১২ সালে পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিল করে এবং অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীও সরে দাঁড়ায়, তখন ঐ বছরই তিনি নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করেন। একথা অনস্বীকার্য, প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় মনোভাবের বাস্তব রূপায়ণই আজকের পদ্মা সেতু।

এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন আজ দক্ষিণ বঙ্গকে সমগ্র বাংলাদেশের সঙ্গে স্থলপথে যুক্ত করেছে। যার ফলে সমগ্র দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন হয়েছে। বিশেষ করে ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দক্ষিণাঞ্চলবাসী নতুন করে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে। এ সেতুর মাধ্যমে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে স্থলপথের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ফলে এলাকার উৎপাদিত কৃষিপণ্যসহ সকল পণ্য দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে কৃষক তাঁর ন্যায্য মূল্য পেয়ে দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে চিরমুক্তির প্রশস্ত দরজা খুঁজে পাবে।

দক্ষিণ বঙ্গে অসংখ্য নান্দনিক পর্যটনশিল্প গড়ে তোলা হবে। সেখানে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানে যা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। শুধু ঢাকামুখী পোশাকশিল্প গড়ে তোলার ফলে রাজধানী ও এর আশপাশে ঘনবসতির ফলে পরিবেশ বিপর্যয় হচ্ছে। পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে এপারে বিভিন্ন জেলায় পোশাক, চামড়াসহ অসংখ্য শিল্প গড়ে উঠবে, সেখানে লাখ লাখ মানুষের নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। কুয়াকাটা, পায়রাবন্দর, সুন্দরবনসহ আশপাশে অসংখ্য পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র গড়ে উঠবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্পকারখানাও গড়ে উঠবে, যা কর্মসংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বয়ে আনবে।

সর্বোপরি বলা যায়, পদ্মা সেতুর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ভাগ্য খুলে গেছে। সেতুকে ঘিরে এ অঞ্চলের মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মানও বদলাতে শুরু করেছে। ১৬ই জুন ২০২২ বরিশালে আধুনিক হাইটেক পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আইসিটি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক। সেখানে ইতোমধ্যে শেখ কামাল আইটি ভিলেজের নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এছাড়াও এখানে বিশ্বমানের অলিম্পিক ভিলেজ, বেনারসি তাঁতপল্লি, রাজউকের উদ্যোগে আইকন টাওয়ার, দেশের মধ্যে একমাত্র ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমিসহ প্রায় চল্লিশটিরও বেশি

বড়ো বড়ো প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণও উদ্যোগ নিয়েছে বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার।

এ সেতুর মাধ্যমে ভোমরা, বেনাপোল স্থলবন্দরসমূহ আরও বেশি কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে। এসব বন্দর এবং মোংলা, পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে স্বল্প সময়ে দ্রুত আমদানিকৃত পণ্য যেমন দেশের বাজারে প্রবেশ করে আমদানি ব্যয় হ্রাস করবে, তেমনি রপ্তানি দ্রব্যও দ্রুত বহির্বিশ্বে পৌঁছানো সম্ভব হবে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পিরোজপুরের বেকুটিয়া ব্রিজ চালু হতে যাচ্ছে। ফলে পদ্মা সেতু হয়ে খুলনা যাওয়ার পথ কমে যাবে বহুলাংশে, সময়ও বাঁচবে অনেক। যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এ অঞ্চলের ব্যাবসাবাণিজ্যে। মানুষ হবে লাভবান, নগদ অর্থ ঘরে আসলে মানুষের মনেও আনন্দের ফল্গুধারা বয়ে আনবে।

পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। ঢাকার সঙ্গে মাওয়া-ভাঙ্গা-যশোর-খুলনা রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে, যা ভবিষ্যতে বরিশালকে রেলওয়ের আওতায় নিয়ে আসবে। ঢাকা থেকে খুলনা, মোংলা, বরিশাল, কুয়াকাটা ইকনোমিক করিডোর স্থাপিত হবে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। নেপাল-ভারত-ভুটানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে, যার ফলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সহজতর হবে। নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্ক স্থাপিত হলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে।

২০১০ সালের এক হিসাব অনুযায়ী, পদ্মা নদী পারাপার হয়ে যেখানে দৈনিক ১২ হাজার যান চলাচল করে, সেখানে সেতু খুলে দিলেই যান চলাচল করবে দ্বিগুণ এবং প্রতিবছর ৭-৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৫০ সালে দৈনিক ৬৭ হাজার যানবাহন চলবে। এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গ্রামীণ উন্নয়নশীল এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, জীবনমানের উন্নয়ন ও জ্ঞান-মনোভাবের ব্যাপক পরিবর্তনে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির বিকল্প নেই। স্বপ্নের পদ্মা সেতু চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা তথা সারা বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার।

পদ্মা সেতু বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়ার ও জাতীয় একতা বৃদ্ধিতে এ সেতু মেলবন্ধ হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত কর্তৃক 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু– জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ' শীর্ষক গবেষণার একটি পঙ্‌ক্তি প্রণিধানযোগ্য– 'পদ্মা সেতু নির্মাণ বিষয়টি এখন আর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা রূপান্তরিত হয়েছে গণ-আকাঙ্ক্ষায়। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিল অনৈতিক এবং মহা অন্যায়, তবে তা বাংলাদেশের জন্য এক মহা আশীর্বাদ (blessing in disguise)। ১৯৭২-১৯৭৩ সালের বাংলাদেশের অর্থনীতি আর ২০১২ সালের অর্থনীতি এক কথা নয়। এখন আমাদের অর্থনীতি অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী। জনগণ অনেকগুণ বেশি আত্মশক্তি-আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। পদ্মা সেতু নির্মাণে জনগণ এখন অনেকগুণ বেশি ত্যাগ স্বীকারে সর্বাত্মক প্রস্তুত– জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি ও সুসংহতকরণের এখনই শ্রেষ্ঠ সময়।' এ উক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়– যে জাতি, জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারে, সে জাতি তাঁরই কন্যার ডাকে সাড়া দিয়ে পদ্মা সেতুসহ আরও বড়ো বড়ো স্থাপনা গড়তে একাত্ম হবে। উন্নয়নের মহাসড়কে সমগ্র জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। তাই বলতে পারি ১৯৭১ সালের পর বাঙালি জাতি আরও একবার বিশ্ব দরবারে প্রমাণ দিয়েছে তার শৌর্য-বীর্য ও গভীর আত্মমর্যাদা বোধের। পদ্মা সেতু বাঙালির গৌরবের প্রতীক।

দেশি-বিদেশি সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে, কুচক্রী মহলের সমালোচনা ব্যর্থ প্রমাণ করে ও তীর্যক মন্তব্য উপেক্ষা করে এক সময়ের স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ দৃশ্যমান বাস্তবতা। বাঙালি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসীম সাহসিকতা ও সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সোনালি ফসল, বাঙালির গর্ব ও অহংকার পদ্মা সেতু ২৫শে জুন ২০২২ উদ্‌বোধন হয়েছে। আর সেই সঙ্গে খুলে গেছে দক্ষিণ বঙ্গবাসীর উন্নতির সোনালি দরজা।

তথ্যসূত্র: দৈনিক যুগান্তর

জাকির হোসেন: পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, বরিশাল

শেখ ফজিলাতুন নেছা আমার মা শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মাকে নিয়ে নিজের লেখার সংকলন *শেখ ফজিলাতুন নেছা আমার মা* শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। ৮ই আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক প্রদান অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে তিনি এ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার লেখা বইটির সংকলনে তাঁর মা ফজিলাতুন নেছাকে কারাগার থেকে লেখা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের এক আবেগঘন চিঠিও রয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ১৯৫৯ সালের ১৬ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু চিঠিটি লিখেছিলেন। ঐ বছর কোনো এক ঈদের পরে তাঁর সহধর্মিণী ফজিলাতুন নেছা কারাগারে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার পর তিনি চিঠিটি লিখেছিলেন। কারাগারে থাকায় সন্তানদের ঈদ আনন্দ মাটি হয়ে যাওয়ায় বঙ্গবন্ধুর দুঃখবোধের কথাও উঠে এসেছে চিঠিতে। এতে তিনি সন্তানদের কারাগারে দেখা করার সময় নিয়ে না আসায় খারাপ লাগার কথা তুলে ধরেন এবং কিছুটা অনুযোগও করেন। পরের সাক্ষাতে সন্তানদের নিয়ে আসার জন্য বেগম ফজিলাতুন নেছাকে অনুরোধ করেন। চিঠির মাধ্যমেও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সবার খোঁজখবর নেন এবং সন্তানদের নাম ধরে ধরে পড়ালেখা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শও দেন। একইসঙ্গে তাঁর জন্য চিন্তা না করতেও বলেন।

প্রতিবেদন: বিদিতা ঘোষ

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

হাছিনা আক্তার

নারীর ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নারীরা নিজেদের যোগ্যতা ও অর্জনকে তুলে ধরে পরিবার, সমাজ ও গণজীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার পূর্বের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীরা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতাকে প্রকাশ করতে পারেন এবং নিজেদের অধিকারগুলো আদায়ে সচেষ্ট হতে পারেন। কোনো বাধা বা সীমাবদ্ধতা ছাড়া নারীরা যখন নিজেদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনার জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাগুলো ব্যবহার করার সুযোগ পান, তখনই আসলে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়। নারীর ক্ষমতায়নই হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ও সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী অনুঘটক।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি নারীদের ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ। তিনিই বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র এবং জনজীবনের সব ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন এবং তখন থেকেই এর কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সব পর্যায়ে নারীদের সম-অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে রাষ্ট্রের বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও সংযোজন করা হয় (অনুচ্ছেদ ২৭ ও ২৮)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করেই বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী ও শিশু অধিকার এবং উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বিবিধ পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে সরকার জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনসহ সব আন্তর্জাতিক সনদ অনুসরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্তকরণকে বহুমাত্রিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষায় নারীদের শতভাগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বর্তমান সরকারের গৃহীত উদ্যোগ ও সাফল্য প্রশংসনীয়।

দেশের নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। বাস্তবায়িত হবে ডেল্টা প্ল্যান-২১০০। নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি সারা বিশ্বে আজ প্রশংসিত। কর্মক্ষেত্রে নারীরা দক্ষতা প্রমাণ করছেন, কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন, নেতৃত্বও দিচ্ছেন। নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে তো বটেই, উন্নত অনেক দেশ থেকেও বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। জেন্ডার ইক্যুইটি প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ।

কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অর্জন অনেক। জাতিসংঘের এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, এজেন্ট অব চেঞ্জ, শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেসকোর 'শান্তি বৃক্ষ' এবং 'গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ' অ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে বাংলাদেশ। নারী উন্নয়নে সঠিক সূচকে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলভুক্ত ২৪টি দেশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার পরই দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ডব্লিউইএফের হিসাবে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নে ৪৮তম অবস্থানে বাংলাদেশ।

নারীর ক্ষমতায়নে বর্তমান সরকার বেশ কিছু আইন, নীতি ও বিধিমালা তৈরি করেছে। বর্তমানে বিচারপতি, সচিব, ডেপুটি গভর্নর, রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে মানবাধিকার কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন। গত দুই দশকে বাংলাদেশে নারীর কর্মসংস্থান প্রায় ৩ ভাগেরও বেশি উন্নীত হয়ে ৩৮ শতাংশে পৌঁছেছে। নারী উন্নয়নের অন্যতম সূচক হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ। সে হিসাবে বাংলাদেশে শুধু পোশাক খাতে আট মিলিয়ন শ্রমিকের মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ ভাগ নারী।

বর্তমানে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নেও বাংলাদেশের অর্জন অনেক। ২০২০ সাল থেকে সব রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা পরিষদে একজন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৩৩ শতাংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সঠিক বিচারে সমাজের প্রতিটি পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। সরকার নারী উদ্যোক্তাদের বিনা জামানতে ও স্বল্পসুদে ঋণ দিচ্ছে। প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক নারীকর্মী বিদেশে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নারী নেতৃত্ব দেশ পরিচালনা করছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার নারী। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম স্থানে, জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে।

নারীর দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে– ভিজিডি কর্মসূচি, দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি, নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প ও কর্মসূচি।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্বে, সংসদে, নীতি নির্ধারণে, রাজনীতি থেকে প্রশাসনে, শিল্প-সংস্কৃতিচর্চায়, বিদেশে শান্তি রক্ষায়, গবেষণা থেকে খেলাধুলা, জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে পর্বতারোহণ– প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি এদেশের নারী আজ স্বীয় প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। পাশাপাশি জেন্ডার বাজেটিং, মাইক্রো ফাইন্যান্স, ই-কমার্সের মতো উদ্যোগগুলো নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করছে।

বর্তমান সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জেন্ডার সমতাভিত্তিক এক উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। এর মাধ্যমেই আর্থসামাজিক কার্যক্রমে নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে।

হাছিনা আক্তার : সিনিয়র সম্পাদক (সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা

ডিজিটাল জরিপ উদ্‌বোধন

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সর্বাধুনিক ফোর্থ জেনারেশন সার্ভে ড্রোনের মাধ্যমে ডিজিটাল জরিপের পাইলটিং শুরু হচ্ছে। ৩রা আগস্ট পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন মাঠে বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ (বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে–বিডিএস)-এর পাইলটিংয়ের উদ্‌বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

ভূমিমন্ত্রী বলেন, প্রচলিত ভূমি জরিপে যেখানে ২০-২৫ বছর লাগে, সেখানে খুব অল্প সময়ে বাংলাদেশে ডিজিটাল জরিপ করা সম্ভব হবে। এই জরিপ শুরুর সাথে সাথে খসড়া ম্যাপ তৈরি করে ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে যাতে জমির মালিক পৃথিবীর যে-কোনো স্থান থেকে তার জমির ম্যাপ দেখে জমির পরিমাণ কম-বেশি হলে সাথে সাথে আপত্তি দাখিল করতে পারেন। ডিজিটাল জরিপে যাবতীয় তথ্য ডিজিটাল ও নির্ভুল হওয়ায় জরিপে স্বচ্ছতা আসবে, মামলা-মোকদ্দমা কমে আসবে, সাথে জনগণের ভোগান্তিও কমে আসবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের অন্য একটি প্রকল্পের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ইমেজ কিনে সেটা মৌজা ম্যাপের সাথে সমন্বয় করে ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষিজমি, জলাভূমি, পাহাড় ও বনভূমি রক্ষাসহ জমির পরিকল্পিত ব্যবহার করাও সম্ভব হবে। এনআইডি ইন্টিগ্রেশন থাকায় এখানে জমির মালিকানা, শ্রেণি ও ধরন ইত্যাদি বিষয়ে ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার গড়ে উঠবে, যা দিয়ে জেলা, উপজেলা ও বিভাগভিত্তিক জাতীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে উঠবে। ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। তিনি বলেন, বিডিএস একবার ঠিকভাবে করা সম্ভব হলে পুনরায় মাঠ জরিপ করার প্রয়োজন হবে না, কারণ জমি হস্তান্তর হলে এসিল্যান্ড প্রয়োজনীয় ডাটা ইনপুট দিয়ে নিজেই ম্যাপ পার্টিশন করে নিতে পারবেন। ম্যাপে সুনির্দিষ্ট দাগে ক্লিক করে ঐ দাগের জমির মালিকানা, জমির পরিমাণ, চৌহদ্দি ও শ্রেণিসহ অন্যান্য তথ্য পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদন: নুসরাত রহমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে 'পদ্মা সেতু'র উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

পদ্মা সেতু শেখ হাসিনার অনন্য অর্জন

শামসুজ্জামান শামস

বাংলাদেশের জন্য ধারাবাহিক অগ্রগতি আর সম্মানের পথটি দিন দিন প্রশস্ত করে চলেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দেশ ও মানুষের উন্নয়নের কাজে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছেন। ১৯৮১ থেকে ২০২২ সাল, মাঝে পেরিয়ে গেছে ৪১ বছর। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পিতার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ, এমনকি বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য অনিবার্য হয়ে উঠেছেন। নিজ মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা, প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও মানবতার কারণে তিনি আজ বিশ্বজয়ী একজন রাজনীতিবিদ। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যক্তিগত গুণাবলি অনেকের কাছেই গবেষণার বিষয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে পদ্মা সেতু। একসময় বৈদেশিক সহায়তা ছাড়া চলতে না পারা বাংলাদেশ এখন নিজস্ব অর্থায়নেই পদ্মা সেতুর মতো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, নানা কেলেঙ্কারির অভিযোগ থেকে মুক্ত স্বপ্নের পদ্মা সেতু এখন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। এই স্বপ্ন পূরণের জন্য সরকার চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল। এই চ্যালেঞ্জে সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজয়ী হয়েছেন। তিনি বলেন– 'পদ্মা সেতু নিজেদের অর্থায়নেই হবে।'

পদ্মা সেতু আমাদের গর্বের সম্পদ, অহংকারের নিদর্শন। এ সেতু আমাদের মর্যাদার প্রতীক, আত্মসম্মানের প্রতীক, কারও কাছে মাথা নত না করে মাথা উঁচু করার প্রতীক, সক্ষমতার প্রতীক ও উন্নয়নের প্রতীক। আর এ প্রতীক রচনার বীর ও সাহসী নায়ক সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। পদ্মা সেতু নিয়ে ষড়যন্ত্রের শেষ ছিল না। দায়িত্বশীল অনেকে এটাও বলেছিলেন, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ পদ্মা সেতু করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ কয়েক বছর এ সেতু নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঝড় তোলা হয়েছিল। পদ্মা সেতু শুধু একটি সেতু নয়, এটি বাংলাদেশের মানুষের স্বাবলম্বিতার প্রতীক। এটি আমাদের ঐক্য ও অটল মনোবলের স্মারক। আমরাও নিজের প্রচেষ্টায় বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ করে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিতে পারি, এটা তার উজ্জ্বল উদাহরণ। শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব যে সত্যি সত্যিই বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে এ দেশের মানুষ সেটা টের পেয়েছে।

মাওয়া প্রান্তে ২৫শে জুন পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'পদ্মা সেতু শুধু একটি সেতুই নয়, এটা আমাদের সক্ষমতা, আমাদের আবেগ। এটা বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। পদ্মা সেতুর জন্য আমি গর্ববোধ করি।'

তিনি আরও বলেন, 'কোটি কোটি দেশবাসীর সঙ্গে আমিও আনন্দিত, গর্বিত এবং উদ্বেলিত। অনেক বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে আর ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে প্রমত্তা পদ্মার বুকে আজ বহু কাঙ্ক্ষিত সেতু দাঁড়িয়ে গেছে। এ সেতু শুধু ইট-সিমেন্ট-স্টিল-লোহার কংক্রিটের একটি অবকাঠামো নয়, এ সেতু আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব, আমাদের সক্ষমতা আর মর্যাদার প্রতীক। এ সেতু বাংলাদেশের জনগণের। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আবেগ, আমাদের সৃজনশীলতা, আমাদের সাহসিকতা, সহনশীলতা আর জেদ।'

সরকারপ্রধান বলেন, 'ষড়যন্ত্রের ফলে আমাদের সেতু নির্মাণ খানিকটা বিলম্বিত হয়েছে, কিন্তু আমরা হতোদ্যম হইনি। শেষ পর্যন্ত অন্ধকার ভেদ করে আমরা আলোর মুখ দেখেছি। পদ্মার বুকে জ্বলে উঠেছে লাল, নীল, সবুজ, সোনালি আলোর ঝলকানি। ৪১টি স্প্যান যেন স্পর্ধিত বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, বাঙালিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না, পারেনি। আমরা বিজয়ী হয়েছি। তারুণ্যের কবি, দ্রোহের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় তাই বলতে চাই– সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়। আমরা মাথা নোয়াইনি।'

সেতুর ওপরে গাড়ি চলাচল করলে রেললাইন বসাতে পারবে কি না সে নিয়ে আশঙ্কা ছিল। ১৭ই জুলাই সেতু কর্তৃপক্ষ রেল কর্তৃপক্ষকে সেতুতে রেললাইন স্থাপনের অনুমতি দেয়। এরপর বিশেষজ্ঞরা নানা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয় রেললাইন বসানোর। ২০শে আগস্ট পদ্মা সেতুতে রেললাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। জাজিরা প্রান্তে সেতুর নীচতলায় রেললাইনের জন্য আরসিসি ঢালাই কাজের উদ্‌বোধন করেন রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন। পদ্মা সেতুতে পাথরবিহীন রেললাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের অধীনে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৯ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের ঠিকাদার চীনের চায়না রেলওয়ে গ্রুপ। পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছে চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড। এটি চায়না রেলওয়ে গ্রুপেরই একটি প্রতিষ্ঠান। রেলওয়ে সূত্র জানায়, পদ্মা রেল লিংক প্রকল্পের কাজ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– ঢাকা থেকে মাওয়া, মাওয়া থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা এবং ভাঙ্গা থেকে যশোর।

পদ্মা সেতু চালুর ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, জিডিপিতেও পদ্মা সেতু অবদান রাখছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে কত ষড়যন্ত্র, কত মিথ্যাচার! কোনো কিছুই দমাতে পারেনি শেখ হাসিনাকে। দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র আর বিশ্বব্যাংক সেতু নির্মাণ প্রকল্প থেকে সরে যাওয়ার পর যে সেতু কল্পনায় ছিল না, সেই পদ্মা সেতু এখন দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। কোনো ষড়যন্ত্রই পদ্মা সেতুর পথ রোধ করতে পারেনি। নিন্দুক আর ষড়যন্ত্রকারীদের মুখে ছাই দিয়ে ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতু কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নয়, পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতিই বদলে দিয়েছে।

১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেন। ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা সেতুর সম্ভাব্যতা বা ফিজিবিলিটি স্টাডি করান। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এসে পদ্মা সেতুর নির্মাণের বাস্তব ও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয় লাভ করে। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতাহারে পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ছিল। সরকার গঠন করেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেন। তিনি ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে পদ্মা সেতুতে রেলপথ সংযোজনের জন্য নির্দেশনা দেন। তাঁর নির্দেশ মতো সেতুর ডিজাইন বা নকশা পরিবর্তন করা হয়। ওপরে মোটরযান সড়ক এবং নীচে রেলপথ অর্থাৎ দোতলা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। ওপরে চার লেনের মোটরযান সড়ক এবং নীচে এক লেনের রেলপথের ব্যবস্থা রেখে নকশা তৈরি হয়।

বিশ্বব্যাংক যখন ২০১২ সালের ২৯শে জুন নানা ধরনের মিথ্যা অজুহাতে পদ্মা সেতুতে প্রত্যাশিত ঋণ বাতিল করে, একই বছর ৮ই জুলাই সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন বাংলাদেশ তার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করবে। তাঁর এই ঘোষণাতে চারদিকে বেশ হাস্যরোল সৃষ্টি হয়েছিল। এসব হাস্যরোল তোয়াক্কা না করেই শুরু হয় পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রে ২০১২ সালের ২৩শে জুলাই পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন পদত্যাগ করেছিলেন। সরকার সেতু প্রকল্পের পরামর্শকের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরীকেও।

সেই সময়ে কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান এসএনসি লাভালিনকে পদ্মা সেতুর পরামর্শকের কাজ পাইয়ে দিতে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগে বিশ্বব্যাংকের চাপে সেতু বিভাগের সচিবসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। সেই মামলায় গ্রেপ্তার হন সেতু বিভাগের সাবেক সচিব মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া। যদিও পরে সেই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কানাডার আদালতে হওয়া মামলায় প্রমাণিত হয় পদ্মা সেতু প্রকল্পে কোনো দুর্নীতি হয়নি। যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, সেতু সচিব মোশারফ হোসেন ভূঁইয়াসহ বাকি অভিযুক্তরা নির্দোষ প্রমাণিত হন। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে যে অভিযোগ তোলা হয় সেটিকে 'মিথ্যা' আখ্যা দেয় কানাডার আদালত।

মূল সেতু নির্মাণ এবং নদীশাসনের কাজ শুরুর পর থেকেই নানা চ্যালেঞ্জ এসেছে। কখনো পদ্মার ভাঙন, আবার কখনো কারিগরি জটিলতায় বিপত্তি দেখা দেয়। মডিফাই করতে হয়েছে নকশায়। কিন্তু কাজ থেমে থাকেনি। ২০১৪ সালের নভেম্বরে কাজ শুরুর পরের বছরেই মাওয়ায় স্থাপিত নির্মাণ মাঠের বেচিং প্ল্যান্টসহ একাংশ নদীভাঙনে বিলীন হয়ে যায়। ২০১৭ সালের দিকে স্রোতের কারণে মাওয়ায় নদীর তলদেশে গভীর খাদ তৈরি হয়। এছাড়া মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে বিভিন্ন সময় ভাঙন দেখা দেয়। ফলে নদীশাসনের কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ঐ বছর ৩১শে জুলাই মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার কুমারভোগের কনস্ট্রাকশন এরিয়ার কিছু অংশে ভাঙন দেখা দেয়। ঐদিন কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে থাকা অনেক মালামাল নদীতে বিলীন হয়ে যায়।

২০১৭ সালে সেতুর খুঁটি বসানোর সময় ডিজাইনে থাকা ২২টি খুঁটির নীচে মাটি পরীক্ষায় নরম মাটি পাওয়া যায়। তখন নকশা সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। শুরুতে প্রতিটি পিলারের নীচে ছয়টি করে পাইল (মাটির গভীরে স্টিলের ভিত্তি বসানো) বসানোর পরিকল্পনা থাকলেও নকশা সংশোধন করে একটি করে পাইল বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এর কারণে খুঁটি নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হতে ঐ বছরের মার্চ পর্যন্ত সময় লাগে।

এই অর্জনকে নস্যাৎ করতে দেশে-বিদেশে কুচক্রীমহল ও তাঁদের দোসররা বিভিন্ন অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতেই নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর দৃঢ় মনোবল ও অসীম সাহসের কারণেই বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে পেরেছে।

ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ও শেখ হাসিনাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিপদে ফেলতে। কিন্তু বাস্তবে তার উলটোটাই হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ঋণচুক্তি বাতিল করা সরকারের জন্য আশীর্বাদই হয়েছে। এত বড়ো প্রকল্প যে বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে করতে পারে, তার সক্ষমতা প্রমাণ হয়েছে। যারা মনে করত বিদেশি সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশ চলতে পারবে না, পদ্মা সেতু তাদের চোখ খুলে দিয়েছে। এতে শেখ হাসিনা সরকারের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আজ গর্ব করে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে শত বাধা অতিক্রম করে দেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা সেতুতে যানবাহন চলাচল করছে। তাঁর মানবিক ও সাহসী নেতৃত্বের কারণেই সব অসম্ভবকে সম্ভব করে বাংলাদেশ আজ বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে আমরাও পারি। সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বিশ্বে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সেতুটিতে রেল, গ্যাস, বৈদ্যুতিক লাইন এবং ফাইবার অপটিক কেবল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা থাকার কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যে বিশাল এলাকা গ্যাস থেকে বঞ্চিত রয়েছে, আগামীতে তারা গ্যাস সংযোগ পাবে। পরে সেখানে কলকারখানা স্থাপিত হবে, বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ, বাণিজ্য, পর্যটনসহ অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে পদ্মা সেতু। ২০৪০ সালে যে উন্নত বাংলাদেশকে আমরা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে পদ্মা সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শামসুজ্জামান শামস : কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক, bk.sams@yahoo.com

আমাদের অভিভাবক হয়ে স্বপ্ন ছুঁয়েছেন

রেজা নওফল হায়দার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড়ো সন্তান। ভাইবোনদের মধ্যেও তিনি সবার বড়ো। অবারিত মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। বাবার চিন্তা-চেতনা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বাধিকার, স্বাধীনতা, মানবিক গুণাবলি, অর্থনৈতিক মুক্তি সব কিছুই তিনি রপ্ত করেছিলেন নিজের মধ্যে। বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে থেকেই রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। ছয় দফা আন্দোলনে রাজপথে ছিলেন। ছিলেন ছাত্রলীগের কর্মী।

১৯৫৪ সাল থেকে তিনি ঢাকায় পরিবারের সাথে মোগলটুলির রজনী বোস লেনের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। পরে মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে স্থানান্তরিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি টিকাটুলির নারীশিক্ষা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৬১ সালের ১লা অক্টোবর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে থাকা শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি আজিমপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন।

শেখ হাসিনা ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় ১৯৬৭ সালে এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের সংসারে সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল নামে দুই সন্তান রয়েছেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে (২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঐ রাতেই শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারের পর তিনি মায়ের সঙ্গে ভাইবোনদের নিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি ও তাঁর বোন শেখ রেহানা বাদে পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করা হয়। তাঁরা সেই সময় পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করছিলেন। এরপর তিনি ভারত, বেলজিয়ামসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থান করতে থাকেন।

আওয়ামী লীগ ১৯৮১ সালে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের সভাপতি নির্বাচিত করে। ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে তিনি ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে আসেন।

১৯৯৬ সালে জাতীয় নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট ঢাকায় এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে গ্রেনেড হামলায় তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। উক্ত হামলায় তাঁর ঘনিষ্ঠজন ও আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমানসহ ১৯ জন মৃত্যুবরণ করেন ও শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হন। গ্রেনেড হামলার তদন্তকে ভিন্ন খাতে করার জন্য 'জজ মিয়া' নাটকসহ বেশকিছু প্রহসন সৃষ্টি করেছিল তৎকালীন চারদলীয় ঐক্যজোট প্রশাসন।

২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলে ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় ২০১৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। শেখ হাসিনা তখনও প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন। ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিপুল ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। ২০১৯ সালের ৭ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবার শপথ গ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনায় শেখ হাসিনা নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েই দেশের অর্থনীতিকে নিয়ে গেছেন উন্নতির শীর্ষে। তাঁরই সুপারভিশনের সুফল জাতি পেতে শুরু করেছে। নিজেদের আত্মপরিচয়ে এবং পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশকে নতুনভাবে পরিচয় করিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে বর্তমানে শতভাগ অঞ্চল বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত। তাঁরই দৃঢ়তায় রহস্যময়ী পদ্মা নদীর বুকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। আধুনিক বিশ্বমানের মেট্রোরেল উদ্‌বোধনের দারপ্রান্তে। উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় আছে বঙ্গবন্ধু টানেল।

ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই মধ্যে প্রশাসনে গতি এনেছে ই-গভর্ন্যান্স, জনগণ সুফল পাচ্ছে। তিনি দেশের প্রায় পাঁচ কোটি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রায় সিংহভাগ মানুষকে বিনামূল্যে করোনা টিকা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক দৃঢ়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। নিঃস্ব অসহায় পরিবারকে সরকারিভাবে বাড়ি প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অনগ্রসর শ্রেণির মানুষকে।

এতসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে স্মরণ করি। জানাই জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

রেজা নওফল হায়দার: সিনিয়র সাংবাদিক, সম্পাদক, সময় প্রতিদিন টুয়েন্টিফোর ও লেখক, naufulreza2000@yahoo.com

রমা চৌধুরী একজনই

রহিমা আক্তার মৌ

যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোটা-ভাতাসহ নানা সুবিধা রয়েছে, সেখানে মুক্তিযোদ্ধার সম্মানটুকুর বাইরে বাড়তি কোনো সুবিধা নেননি। চাননি সন্তানদের জন্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কিছু হোক। চাননি প্রধানমন্ত্রী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক, কেউ তাঁকে দয়া দেখাক। এক নজিরবিহীন উদাহরণ। তিনি হলেন 'একাত্তরের জননী' রমা চৌধুরী। বাংলার বুকে রমা চৌধুরী একজনই।

> মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। এই দেশটাকে আমাদেরই গড়তে হবে। দেশের মানুষকে আমি সেই কথাটিই বলতে চাই। চলুন, বিলাসিতা-উপভোগ এসব বাদ দিয়ে সবাই মিলে আমরা এই দেশ গড়ি। –রমা চৌধুরী

রমা চৌধুরী ২৭শে জুলাই ২০১৩ আলোচনায় আসেন। চট্টগ্রামের পথে পথে খালি পায়ে বই ফেরি করে বিক্রি করেন এক মুক্তিযোদ্ধা, শুধু মুক্তিযোদ্ধাই নন, স্বাধীনতা যুদ্ধে যিনি হারিয়েছেন স্বজন আর নিজের জীবনের মূল্যবান অনেক কিছু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান গণভবনে। ৪০ মিনিটের সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদমাতা হিসেবে অনন্য অবদান রাখায় আর্থিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিলে তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। জীবনে তিনি কখনো মানুষের দয়া-সহানুভূতির জন্য কাতর হননি। এটা হয়ত রমা চৌধুরীকে দিয়েই সম্ভব।

১৯৪১ সালের ১৪ই অক্টোবর চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার পোপাদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রমা চৌধুরী। মাত্র তিন বছর বয়সে বাবা রোহিনী চৌধুরীকে হারান। মা মোতিময়ী চৌধুরী শত বাধা পেরিয়ে তাঁকে পড়াশোনার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে যান। দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রথম নারী স্নাতকোত্তর (এমএ) ডিগ্রিধারী তিনি। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের এক উত্তালক্ষণে তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়েছেন। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে যেসব অগণিত মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন তাঁদের একজন চট্টগ্রামের রমা চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে মাস্টার্স করে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হয়েছিলেন এই নারী। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ তাঁর জীবনটাকে ওলটপালট করে দেয়। ১৯৬২ সালে কক্সবাজার বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ কর্মজীবন শুরু করেন রমা চৌধুরী। পরে দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি বিভিন্ন উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি তিন পুত্রসন্তানের জননী। শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত ছিলেন রমা চৌধুরী। স্বামী তখন ছিলেন ভারতে। ১৯৭১ সালের ১৩ই মে শিশুসন্তান নিয়ে চট্টগ্রামের পোপাদিয়ায় গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। সেইদিন এলাকার পাকিস্তানি দালালদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সেনারা রমা চৌধুরীদের বাড়িতে হানা দেয়। নিজের মা এবং দুই শিশুসন্তানের সামনে তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। হানাদারদের হাত থেকে কোনোমতে মুক্ত হয়ে রমা চৌধুরী পুকুরে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন পুনরায় নির্যাতনের ভয়ে। চোখের সামনে গান পাউডার দিয়ে তাঁদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় পাকিস্তানি সেনারা। ঘরের মূল্যবান মালামাল, নিজের লেখা সাহিত্যকর্ম চোখের পলকেই পুড়ে যেতে থাকল। কিন্তু হানাদারের ভয়ে কেউ আগুন নেভাতে সেদিন এগিয়ে আসেনি। এক পর্যায়ে রমা চৌধুরী নিজেই ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেন ধ্বংসযজ্ঞ থেকে ছিটেফোঁটা কিছু রক্ষা করার, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন।

ঘরবাড়িহীন বাকি আটটি মাস তাঁকে তিনটি শিশুসন্তান আর বৃদ্ধ মাকে নিয়ে জলে-জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াতে হয়েছে। রাতের বেলায় পোড়া ভিটায় এসে কোনোমতে পলিথিন বা খড়কুটো নিয়ে মাথায় আচ্ছাদন দিয়ে কাটিয়েছেন। অনাহারে আর অর্ধাহারে শীতে দুসন্তান সাগর আর টগরের অসুখ বেঁধে যায়। বড়ো ছেলে সাগর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। ১৫ই ডিসেম্বর থেকে খুব শ্বাসকষ্ট শুরু হয় সাগরের। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়, ২০শে ডিসেম্বর রাতে মৃত্যুবরণ করে সাগর। একই অসুখে আক্রান্ত দ্বিতীয় সন্তান টগর। ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি মারা যায় টগর। দুই সন্তান হারিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পর টানা চার বছর জুতো পড়েননি রমা চৌধুরী। নিকটজনের পীড়াপীড়িতে অনিয়মিতভাবে জুতো পড়া শুরু করেন। স্বাধীনতার পর রমা চৌধুরী প্রথম সংসারের পরিসমাপ্তি হলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। কিন্তু সংসার বাঁধতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হন, সংসার ভাঙল। দ্বিতীয় সংসারে জন্ম নেয় ছেলে টুনু। ১৯৯৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বোয়ালখালীর কানুনগোপাড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় টুনুও। হিন্দু ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী শবদেহ পোড়ানোতে বিশ্বাস করেননি রমা চৌধুরী। তাই তিন সন্তানকেই দেওয়া হয় মাটিচাপা। এরপর ১৫ বছর ধরে জুতো ছাড়াই পথ চলেন রমা চৌধুরী। তিনি বলেন–

> মুক্তিযুদ্ধ আমার কাঁধে ঝোলা দিয়েছে। আমার খালি পা, দুঃসহ একাকীত্ব মুক্তিযুদ্ধেরই অবদান। আমার ভিতর অনেক জ্বালা, অনেক দুঃখ। আমি মুখে বলতে না পারি, কালি দিয়ে লিখে যাব। আমি নিজেই একাত্তরের জননী।

তাঁর লেখা *একাত্তরের জননী* গ্রন্থের ২১১ পৃষ্ঠায় রমা চৌধুরী লিখেছেন, 'ঘরে আলো জ্বলছিল হ্যারিকেনের। সেই আলোয় সাগরকে দেখে ছটফট করে উঠি। দেখি তার নড়াচড়া নেই, সোজা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে, নড়চড় নেই। মা ছটফট করে উঠে বিলাপ ধরে কাঁদতে থাকেন, 'আঁর ভাই নাই, আঁর ভাই গেইয়্যে গোই (আমার ভাই নেই, আমার ভাই চলে গেছে)।'

রমা চৌধুরী নিজের লেখা নিয়ে বলেন–

> অন্ধ সমাজব্যবস্থা আর অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমাজ সচেতনতামূলক বাস্তবধর্মী লেখাই মূলত আমি লিখে থাকি। এর মাধ্যমে সমাজের কুসংস্কার, ভ্রান্তধারণা, সাম্প্রদায়িকতা, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ অর্থাৎ শ্রেণিবৈষম্য দূর করাই আমার লেখার উদ্দেশ্য।

রমা চৌধুরীর মোট প্রকাশিত বই ২০টি। লিখেছেন সাহিত্যের প্রায় সব শাখায়– সমালোচনা সাহিত্য, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতিকথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন ইতিহাস গ্রন্থ, গল্প, উপন্যাস, লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং ছড়া। সাহিত্য বিশ্বে এক অনন্য নজির রচনা করেছেন রমা চৌধুরী।

প্রবন্ধ সংকলন: *রবীন্দ্র সাহিত্য ভৃত্য*, *নজরুল প্রতিভার সন্ধানে*, *সপ্তরশ্মি*, *চট্টগ্রামের লোক সাহিত্যের জীবন দর্শন*, *অপ্রিয় বচন*, *যে ছিল মাটির কাছাকাছি*, *ভাববৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ*, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*। স্মৃতিকথা: *সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, *স্মৃতির বেদন অশ্রু ঝরায়*। কাব্যগ্রন্থ: *স্বর্গে আমি যাব না*, *শহীদের জিজ্ঞাসা*, *১০০১ দিন যাপনের পদ্য*। পত্র সংকলন: *নীল বেদনার খাম*। উপন্যাস: *একাত্তরের জননী*, *লাখ টাকা*, *হীরকাদুরীয়*। গল্প সংকলন: *আগুন রাঙ্গা আগুন ঝরা*, *অশ্রুভেজা একটি দিন*।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিজের লেখা বই উপহার দিচ্ছেন রমা চৌধুরী

গত কয়েক বছর থেকেই তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ ছিলেন। অর্থকষ্টে ঠিকমতো চিকিৎসা নিতে পারেননি। ২০শে জুন ২০১৭ পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়– 'অর্থের অভাবে লেখিকা রমা চৌধুরী হাসপাতাল ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা দরকার।' তখন রমা চৌধুরীর বইয়ের প্রকাশক আলাউদ্দিন খোকন বলেছিলেন, 'রমা চৌধুরী নিজেই কারও কাছ থেকে অর্থ সহযোগিতা নিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করতে চান না। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যেমন কোনো আর্থিক সহযোগিতা নেননি, তেমনি কোনো ব্যক্তির কাছ থেকেও নিতে চান না। নিজের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন এই সংগ্রামী নারী।' কোমরে পাওয়া আঘাত, গলব্লাডারে পাথর, ডায়াবেটিস, শ্বাসকষ্টসহ বেশ কিছু শারীরিক জটিলতায় আক্রান্ত ছিলেন তিনি। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বাসায় পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত রমা চৌধুরী নিজের লেখা বই ফেরি করে বিক্রি করতেন। ১৫ই জানুয়ারি ২০১৮ রমা চৌধুরীকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা রমা চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৮ তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। রাতে রমা চৌধুরীকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হলে তাঁর শুভানুধ্যায়ী মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৮ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন রমা চৌধুরী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

২০ বছর ধরে লেখ্যবৃত্তিকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন রমা চৌধুরী। যদিও তাঁর লেখ্যবৃত্তির পেশা একেবারেই স্বনির্বাচিত ও স্বতন্ত্র। তিনি প্রথমে একটি পাক্ষিক পত্রিকায় লিখতেন। বিনিময়ে সম্মানীর বদলে পত্রিকার ৫০টি কপি পেতেন। সেই পত্রিকা বিক্রি করেই চলতেন তিনি। পরে নিজেই নিজের লেখা বই প্রকাশ করে বই ফেরি করতে শুরু করেন। এছাড়া তাঁর স্মৃতিতে একাত্তর নিয়ে অগ্রন্থিত কিছু গদ্য আছে। ২০১৫ সালের 'অনন্যা' ঈদ সংখ্যায় নিজের জীবনে বেড়ালের ভূমিকা নিয়ে অসাধারণ এক গদ্য লেখেন। ২০১৪ সালে তিনি অনন্যা শীর্ষ দশ সম্মাননা পান।

সাংবাদিক, লেখক ও শিশু সাহিত্যিক রাশেদ রউফ রমা চৌধুরীকে নিয়ে লিখেছেন–

সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুই বলেছিলেন, তিনি জীবনযাপন করেন না, সাহিত্যযাপন করেন। রমা চৌধুরীরও উচ্চাশা ছিল প্রায় সেরকমই। তাঁর চলাফেরা, জীবনাচরণ, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা এবং কথাবার্তার অন্তরঙ্গ আলোকে আমাদের বুঝে নেওয়া কষ্ট হয়নি যে, তিনি ছিলেন সাহিত্যের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ এক অনন্য মানুষ। বই লিখেছেন, প্রকাশ করেছেন এবং তা প্রচার-বণ্টন করে অতিবাহিত করেছেন তাঁর পুরোটা সময়। তাঁর জীবনচলায় কোনো ছেদ ছিল না, নিরন্তর ছুটেছিলেন সামনে। ঘুরে বেড়ালেন সমাজের অলিতে-গলিতে। কেউ কী ভাবলো, তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না তাঁর। তিনি একাকী। নৈঃসঙ্গের হাত ধরে তাঁর এগিয়ে চলা। বাইরের বিরূপ প্রতিবেশ ও রূঢ় প্রতিবন্ধকতা কখনো তাঁর গতিরোধক হিসেবে কাজ করেনি। বই তাঁর সবসময়ের বাহন। এই বাহন আবার হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করেছে। সে বাধা সরিয়েছে, সাহস বাড়িয়েছে, আলোর বানে আঁধার তাড়িয়েছে। সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে এমন সেতুবন্ধন ঘটেছে, তার দ্বন্দ্বশীর্ণ জটিল-কঠোর জগৎকে তাই আত্মস্থ করতে পেরেছেন সহজে।

রমা চৌধুরীর মতো অসংখ্য মায়েদের মহান আত্মত্যাগেই একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বরে আমাদের বিজয় এসেছিল। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরেও রমা চৌধুরীকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়। বই ফেরি করে জীবিকানির্বাহ করতে হয়, এটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ভাবতেই লজ্জা লাগে। অন্যদিকে অহংকার বোধ হয় এই ভেবেই, রমা চৌধুরীরা নিজের প্রিয়জন হারিয়ে, জীবনের মূল্যবান সব হারিয়ে আমাদের জন্যে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। রমা চৌধুরীকে জীবনের টানাপোড়েন থেকে আমরা মুক্তি দিতে পারিনি, বরং তিনিই না ফেরার দেশে চলে গিয়ে আমাদেরকে দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ১৪ই অক্টোবর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর আদর্শ হোক আমাদের পাথেয়।

রহিমা আক্তার মৌ: সাহিত্যিক, কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক, rbabygolpo710@gmail.com

প্রধানমন্ত্রীর সম্মাননায় আরেকটি অর্জন

সুস্মিতা চৌধুরী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অদম্য সাহস, উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। তিনি দেশকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে এক অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছেন, অধিষ্ঠিত করেছেন মর্যাদা ও সম্মানের আসনে। সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানতম শক্তি ও সম্পদ। তাঁর দৃঢ় মনোবল, সাহসী নেতৃত্ব, ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা এবং উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে দেশ ও বিদেশে তুমুল জনপ্রিয় করে তুলেছে। বিশ্ব পরিমণ্ডলে তিনি এখন এক অনন্য কণ্ঠস্বর।

চলতি মেয়াদসহ চারবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। তাঁর নেতৃত্বে অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ত্যাগে, দয়ায়, ক্ষমায় ও সাহসের মহিমায় শেখ হাসিনা আজ বিশ্বের বিস্ময়। শেখ হাসিনা শুধু আওয়ামী লীগেরই নেতা নন, তিনি আজ দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে স্টেটসম্যান বা রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হয়েছেন। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে তথ্যপ্রযুক্তির এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছেন। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর থেকেই দেশের উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ মনোযোগ দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ধারাবাহিক উন্নতির পাশাপাশি তিনি পেয়েছেন আন্তর্জাতিক অনেক সম্মাননা পদক। বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি অসংখ্য পুরস্কার, পদক, ডক্টরেট ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। এর মধ্যে জাতিসংঘের বেশ কটি পুরস্কার রয়েছে। এছাড়াও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর পদকের তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরেকটি পদক। ২০২২ সালের ২৯শে মে পল্লি উন্নয়নের জন্য 'সেন্টার অন ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক' (সিরডাপ) কর্তৃক 'আজিজুল হক পল্লি উন্নয়ন পদক ২০২১' পান। এ পদকটি সিরডাপের মহাপরিচালক ডা. চেরদসাক ভিরাপা প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। পুরস্কারটি জনগণকে উৎসর্গ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাকে সিরডাপ কর্তৃক এ পদকটি প্রদান করায় আমি মনে করি এটা আমার বাংলাদেশের জনগণের প্রাপ্য। এ পদক প্রাপ্তির জন্য আমাকে মনোনয়ন করা মানে বাংলাদেশকে মনোনয়ন করা। তিনি বলেন, সিরডাপ সবসময় তাদের সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে পল্লি উন্নয়নের ওপর কাজ করে। সেখান থেকে একটা পুরস্কার পাওয়া আমার জন্য, আমার দেশের জন্য নয় অত্যন্ত সম্মানজনক, যা বাংলাদেশকে সম্মান জানানো।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পল্লি উন্নয়নটা অর্থাৎ গ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে পারলে দেশের উন্নয়ন হয়। সেটাই আমরা বিশ্বাস করি। দেশের উন্নয়ন করতে হলে একেবারে তৃণমূলের মানুষকে বাদ দিয়ে কখনো উন্নয়ন হতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম তৃণমূল ঘিরে। যেমন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব, আমাদের ডিজিটাল সেন্টার প্রথমে কিন্তু সেই চর কুকরিমুকরি থেকে শুরু করি। অর্থাৎ একেবারে রিমোট এলাকা সেখানে আমরা শুরু করি। তিনি গ্রামের মানুষকে স্বাবলম্বী করতে নিজস্ব চিন্তা থেকে প্রথমে 'একটি বাড়ি একটি খামার'-এর নাম পরিবর্তন করে 'আমার বাড়ি আমার খামার' কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক করে দিয়েছি। যেখানে গ্রামের মানুষ পায়ে হেঁটে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে।

সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে এখন প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষার জন্য প্রতি দুই কিলোমিটারের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় করা, যাতে করে ছেলেমেয়েরা হেঁটে স্কুলে যেতে পারে। আমাদের প্রাইমারি শিক্ষা যেমন অবৈতনিক, পাশাপাশি আমাদের নারী শিক্ষাও অবৈতনিক। সেই সঙ্গে তৃণমূল মায়েরা যখন বাচ্চাদের স্কুলে পাঠায়, মায়েদের নামে আমরা বৃত্তি দেই। সরকার প্রায় শতভাগ মানুষের সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান–এগুলো মানুষের মৌলিক চাহিদা। আমাদের এখন যত মানুষ গৃহহীন আছে অর্থাৎ ভূমিহীন-গৃহহীন তাদের আমরা বিনা পয়সায় ঘর করে দিচ্ছি। যাতে একটা ঘর পেলে সেটাই মানুষের কর্মসংস্থান হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে সহায়তার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা– এগুলো আমরা দিচ্ছি, সেটাও মানুষের আর্থসামাজিক কাজে লাগে। এগুলো সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা, নিজস্ব চিন্তাভাবনার ফসল। যার সুফল দেশের মানুষ পাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য সম্মাননা

২০১৯: বর্তমান সরকারের বাস্তবায়নাধীন পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের 'এশিয়ান টাউনস্কেপ জুরিস অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। ২০১৯: আইসিটি খাতে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তিনটি সম্মাননা। সম্মাননাগুলো হলো– 'ডব্লিউআইটিএসএ গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড', 'ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড' এবং 'গোভইনসাইডার ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড'। ২০১৮: মানবিক কারণে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে নজির স্থাপন করায় ইন্টার প্রেস সার্ভিস

(Inter press service) নিউজ এজেন্সি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' (International Achievement Award) প্রদান করে। ২০১৮: রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে দাতব্য সংগঠন 'গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন' (Global Hope Coalition)-এর পরিচালনাপর্ষদ 'স্পেশাল রিকগনিশন ফর আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' (Special Recognition For Outstanding Leadership Award) প্রদান করে। ২০১৮: যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গ্লোবাল সামিট অব উইমেন নারী নেতৃত্বের সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। ২০১৬: লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য ইউএন উইমেনের পক্ষ থেকে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম-এর পক্ষ থেকে 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড'। ২০১৬: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। ২০১৫: জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় অবদানের জন্য জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার– 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার। ২০১৫: ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘ ITU (International Telecom Union)-এর 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার'-এ ভূষিত করে। ২০১৫: রাজনীতিতে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনে 'WIP (Women in Parliament) Global Award' দেওয়া হয়। ২০১৪: নারী ও শিশুশিক্ষা ও উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ইউনেসকো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'শান্তিবৃক্ষ' পদকে (Peace Tree Award) ভূষিত করে। ২০১৪: খাদ্য উৎপাদন ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রধানমন্ত্রীকে সম্মাননা সার্টিফিকেট প্রদান করে। ২০১৩: খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ সাউথ কো-অপারেশন শেখ হাসিনাকে 'South South Award' এ ভূষিত করে। ২০১৩: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নপ্রসূত 'একটি বাড়ি ও একটি খামার প্রকল্প' ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত তথ্যপ্রযুক্তি মেলায় সাউথ এশিয়া ও এশিয়া প্যাসিফিক 'Manthan Award' লাভ করে। ২০১৩: জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Diploma Award' লাভ করে। ২০১২: শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার জন্য ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করে। ২০১২: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদানের জন্য UNESCO প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Cultural Diversity' পদকে ভূষিত করে। ২০১১: ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সের স্পিকার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দূরদর্শী নেতৃত্ব, সুশাসন, মানবাধিকার রক্ষা, আঞ্চলিক শান্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে অনবদ্য অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Global Diversity Award' প্রদান করে। ২০১১: স্বাস্থ্য খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য International Telecommunication Union (ITU) South South News এবং জাতিসংঘের আফ্রিকা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে South South Award: Digital Development Health পুরস্কারে ভূষিত করে। ২০১১: গণতন্ত্র সুসংহতকরণে প্রচেষ্টা ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য ডফিন বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রান্স স্বর্ণপদক প্রদান করে। ২০১১: বাংলা একাডেমির সম্মাননা সূচক ফেলোশিপ পান। ২০১০: শিশুমৃত্যু হ্রাস সংক্রান্ত MDG-4 অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ MDG (Millenium Development Goal) Award প্রদান করে। ২০১০: ২৩শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য St. Petrsburg University সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করে। ২০১০: বিশ্বখ্যাত 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক ২০০৯'-এ ভূষিত হন। ২০০৫: গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তির পক্ষে অবদান রাখার জন্য শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অব রাশিয়া। ২০০০: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার জন্য ম্যাকন ওমেন্স কলেজ যুক্তরাষ্ট্র 'পার্ল এস বাক পদক' প্রদান করে। ২০০০: ব্রাসেলসের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় Doctor Honorious Causa প্রদান করে। ২০০০: University of Bridgeport কানেকটিকাট, যুক্তরাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে Doctor of Humane letters প্রদান করে বিশ্ব শান্তি উন্নয়নে অবদানের জন্য। ১৯৯৯: মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৯৯: ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ FAO কর্তৃক 'সেরেস পদক' লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৯: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব লজ' পান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৮: নরওয়ের রাজধানী অসলোয় মহাত্মা গান্ধী ফাউন্ডেশন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এম কে গান্ধী' পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৯৮: শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে 'মাদার তেরেসা পদক' প্রদান করে নিখিল ভারত শান্তি পরিষদ। ১৯৯৮: পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রাখার জন্য ইউনেসকো শেখ হাসিনাকে 'ফেলিক্স হুফে বইনি' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৯৮: শান্তি নিকেতন বিশ্বভারতীর এক আড়ম্বরপূর্ণ বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনাকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৯৭: লায়ন্স ক্লাবসমূহের আন্তর্জাতিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক 'রাষ্ট্রপ্রধান পদক'-এ ভূষিত হন। ১৯৯৭: রোটারি ইন্টারন্যাশনালের রোটারি ফাউন্ডেশন শেখ হাসিনাকে 'পল হ্যারিস ফেলো' নির্বাচিত করে এবং ১৯৯৬-১৯৯৭ সালের সম্মাননা মেডেল প্রদান করে। ১৯৯৭: নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শান্তি, গণতন্ত্র ও উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনে অনন্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ শেখ হাসিনাকে 'নেতাজী মেমোরিয়াল পদক ১৯৯৭' প্রদান করে। ১৯৯৭: জাপানের বিখ্যাত ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৯৭: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' উপাধি প্রদান করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু মেধা ও দক্ষতায় নয়, সততায়ও বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স' নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১৭৩টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে। সেখানে সৎ সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান তৃতীয়। এছাড়া সিঙ্গাপুরভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্য স্ট্যাটিস্টিকস ইন্টারন্যাশনাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেছে।

সুস্মিতা চৌধুরী: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

ডেঙ্গুজ্বর নিয়ন্ত্রণে সতর্কতা জরুরি

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশ দেখা যাচ্ছে। ডেঙ্গুজ্বর মোকাবিলায় মশক নিধন, মশার প্রজননক্ষেত্র ধ্বংসসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। এখন আমাদের সময় সচেতনতার, না হলে চরম বিপর্যয় হতে পারে।

ডেঙ্গুজ্বরের জন্য দায়ী ফ্ল্যাভিভাইরাসগণের অন্তর্ভুক্ত ডেঙ্গু ভাইরাস বা ডেঙ্গি ভাইরাস। এডিস মশা ডেঙ্গু ভাইরাসসহ ইয়েলো ফিভার ভাইরাস, জিকা ভাইরাস, চিকুনগুনিয়া ভাইরাসেরও বাহক। এই ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপ পাওয়া গিয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। জীবাণুবাহী এডিস মশা কাউকে কামড়ালে সেই ব্যক্তি চার থেকে ছয় দিনের মধ্যে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যদি কোনো জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ায় তাহলে সেই মশা ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এই জীবাণুবাহী মশাটি যখন অপর কোনো ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন তার দেহে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে খুব সহজে একজন থেকে অপরের দেহে এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। তিন ধরনের ডেঙ্গু হতে দেখা যায়, ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু ফিভার, ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোম।

ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণত অল্প দিনেই সুস্থ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে অসুস্থতা বাড়তে থাকে এবং মৃত্যুও ঘটতে দেখা যায়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছর ২০২২ সালের শুরু থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন প্রায় সাত হাজারের বেশি রোগী। এ সময়ে শুধু ঢাকায়ই আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ছয় হাজারের বেশি রোগী। জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩১ জনের।

সাধারণত ভাইরাস জ্বরের যে লক্ষণ তার সবই ডেঙ্গুজ্বরে থাকে। ডেঙ্গুজ্বরের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে– সারা শরীরের মাংসপেশিতে বিশেষ করে হাড়, কোমর, পিঠসহ অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। ব্যথা, জ্বর হওয়ার চার বা পাঁচ দিনের সময়ে এলার্জি বা ঘামাচির মতো সারা শরীরজুড়ে লালচে দানা দেখা যায়। এ জ্বর কম বা বেশি উভয়ই হতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। খাবারে অরুচি ও বমি বমি ভাব হয়। সাধারণত জ্বর তিন থেকে চার দিন পর ভালো হয়ে যায়, তবে রক্তের প্লাটিলেট কমতে থাকে। কখনো মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে আবার জ্বর আসে এবং শরীরে র‍্যাশ দেখা যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে প্রচণ্ড মাথাব্যথার সঙ্গে শরীরেও প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয় এবং জ্বর থাকে। কখনো চোখের পেছনে ব্যথা অনুভব করে। যাদের বেশি জ্বর থাকে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন– চামড়ার নীচ, নাক, মুখ, দাঁত ও মাড়ি, চোখের মধ্যে এবং চোখের বাহিরে, কফ, বমি ও পায়খানার সঙ্গে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হতে পারে আবার রোগীর রক্তনালী থেকে প্লাজমা লিকেজের কারণে বুকে ও পেটে পানি জমতে পারে। পানি শূন্যতা বেশি হওয়ায় প্রসাবের পরিমাণ কমে যেতে পারে, অনেক সময় লিভার আক্রান্ত হয়ে রোগীর জন্ডিস, কিডনিতে আক্রান্ত হয়ে রেনাল ফেইলিউর ইত্যাদি জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ প্রায় কাছাকাছি হলেও কিছু পার্থক্য আছে। চিকুনগুনিয়াতে র‍্যাশ সাধারণত ১-২ দিনেই দেখা যায়। এখানে মাংসপেশী বা পিঠ ব্যথার তুলনায় অস্থিসন্ধি, হাতের আঙুল এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা বেশি অনুভূত হয়। তবে চোখের পেছনে ব্যথা, রক্তক্ষরণ, প্লাটিলেট কমে যাওয়া, শক এগুলো হয় না বললেই চলে। চিকুনগুনিয়া সাধারণত দ্বিতীয় বার হয় না তবে ডেঙ্গু দ্বিতীয় বার হলে জটিলতা আরও বেড়ে যায় বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে।

সাধারণত বর্ষাকালে শহর এলাকায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ লক্ষ করা যায়। এজন্য বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে করোনা টেস্টের পাশাপাশি ডেঙ্গুর টেস্ট করাও জরুরি, বিশেষত শহরাঞ্চলে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরও সেরকম নির্দেশনা দিয়েছে।

খুবই সাধারণ কিছু নিয়মকানুন মেনে চলে আমরা ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে পারি। আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়াসহ নতুনভাবে এ রোগের জীবাণুবাহী মশার আরও প্রসার না ঘটে সেজন্য সবার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাসার পাশে, ছাদে, পরিত্যক্ত জিনিসের ভেতর, ফুলের টব, এয়ার কন্ডিশনার, ফ্রিজ, বাথরুম ইত্যাদি জায়গায় যেন পানি না জমে থাকে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অন্তত তিন দিনে এক বার এসব জায়গা পরিষ্কার করতে হবে। সরকার এবং সিটি করপোরেশন ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশক নিধন অভিযান পরিচালনা করছে। এছাড়া জলাশয়, নর্দমা, রাস্তার পাশের গর্তও পরিষ্কার করার ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবে আমাদের সকলকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। করোনার জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা (ঘন ঘন সাবান-পানি বা ৬০% এলকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরা, যথা সম্ভব বাসায় থাকা, হাঁচি-কাশি শিষ্টাচার ইত্যাদি) মেনে চলার পাশাপাশি বাসাবাড়ি এবং উল্লিখিত স্থানসমূহও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এডিস মশা সকালে ও সন্ধ্যায় বেশি কামড়ায়, তাই এ সময়ে বেশি সচেতনতা প্রয়োজন।

ডেঙ্গুজ্বর মোকাবিলায় সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ব্যক্তিপর্যায়ে উদ্যোগী না হলে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য অর্জন কখনো সম্ভব হবে না। ডেঙ্গুজ্বরের মূল অনুঘটক এডিস মশা দূরীকরণের বিষয়ে সতর্ক না হলে, তা আমাদের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই মশকধ্বংসে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। পরিচ্ছন্নতাতেই ডেঙ্গু প্রতিরোধ সম্ভব। আসুন সচেতন হই, জীবন বাঁচাই।

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী : কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক ও চিকিৎসক, jafri.mhasan@gmail.com

পর্যটনশিল্পে বাংলাদেশ

ফাতেমা আক্তার

যুগ যুগ ধরে বহু পরিব্রাজক ও ভ্রমণকারী বাংলাদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে ভ্রমণে এসে আবিষ্কার করেছিলেন বাংলার মাটি, ফসল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তাঁর লিখিত *রিহালা* গ্রন্থে এদেশের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বারংবার ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশে ভ্রমণের প্রয়াস। সীমাহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলানিকেতন বাংলাদেশ। আমাদের রয়েছে সুবিশাল সমুদ্রসৈকত, পাহাড়, জলপ্রপাত, প্রত্নতত্ত্বের প্রাচুর্য, ঐতিহাসিক নিদর্শনসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি আমাদের দেশকে পরিণত করেছে বহুমাত্রিক আকর্ষণসমৃদ্ধ অনন্য পর্যটন গন্তব্যে, যা পর্যটকদের জন্য তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে।

পর্যটন এখন শুধুই আনন্দের খোরাক নয়, এটা একটি শিল্প। দেশ স্বাধীনের পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান দেশের অন্যান্য সেক্টরের মতো পর্যটনশিল্প নিয়েও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন এ দেশের উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে পর্যটনশিল্প। পর্যটনশিল্পের বিকাশে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বঙ্গবন্ধু এর সঠিক ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দেন। তিনি ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার মূল লক্ষ্যই ছিল দেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করা। সেই থেকে এখন অবধি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন কক্সবাজারকে এশিয়ার ভিয়েনা হিসেবে তৈরি করতে। সে লক্ষ্যে তিনি কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে ঝাউবনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। এছাড়া তিনি সমুদ্রের অমিত সম্ভাবনাকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে উত্তরণে ১৯৭৪ সালে সমুদ্রসীমা আইন প্রণয়ন করেছিলেন। কুয়াকাটাসহ বিভিন্ন পর্যটন স্থান নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ছিল দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নৃসংশভাবে হত্যার কারণে তিনি তা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি।

যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন রাখতে পারে অনেক বড়ো ভূমিকা। বিশ্বের অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস পর্যটন। পৃথিবীতে বর্তমানে ১৪০ কোটিরও বেশি পর্যটক রয়েছে। প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে এ সংখ্যা। বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২০০ কোটি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশে মোট ১৬ লাখ ৪০ হাজার পর্যটক আসে। এর পরবর্তী বছরগুলোতে আরও বেশি পর্যটকদের আসার কথা থাকলেও করোনা মহামারির কারণে তা আর হয়নি। দীর্ঘ প্রায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত পর্যটন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে দেশে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় পর্যটকের সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোভিড-১৯ মহামারিতে পর্যটনশিল্পের যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের পর্যটনে বিভিন্ন উপখাতের ব্যাবসায় জড়িত পর্যটন অংশীজনদের সহায়তার জন্য ঘোষণা করেছেন এক হাজার ৫০০ কোটি টাকার প্রণোদনা। এছাড়া পর্যটনশিল্পের ক্ষতি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন, করোনাকালীন পর্যটনশিল্প পুনরায় চালুকরণের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা প্রস্তুত ও বিতরণ, অনুসরণীয় নির্দেশিকার আলোকে পর্যটনশিল্পের অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ট্যুরিজম রিকোভারি প্ল্যান প্রস্তুতকরণ, পর্যটনশিল্পের ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্রণোদনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, অন-অ্যারাইভাল ভিসার আওতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে পর্যটনশিল্পের সর্বোচ্চ বিকাশে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যে পুরো দেশকে আটটি পর্যটন জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক জোনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করা হবে এসব পরিকল্পনা। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রথমবারের মতো সরকারি-বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে কক্সবাজারে পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণে ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোতে প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ হবে ৩৭ হাজার কোটি টাকা। পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ হবে ১ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে– কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন, আধুনিক হোটেল-মোটেল নির্মাণ, সোনাদিয়াকে বিশেষ পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা, ইনানি সৈকতের উন্নয়ন, টেকনাফের সাবরাংয়ে ইকো ট্যুরিজম পার্ক নির্মাণ, শ্যামলাপুর সৈকতের উন্নয়ন, ঝিলংঝা সৈকতের উন্নয়ন, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ, চকরিয়ায় মিনি সুন্দরবনে পর্যটকদের গমনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডুলাহাজরা সাফারি পার্কের আধুনিকায়ন ইত্যাদি। চাঁদপুরের মেঘনার চরে ছয় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র। এই প্রকল্পে রয়েছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের জাদুঘর, পানির উপর ভাসমান কটেজ, চার কিমি. দীর্ঘ কেবল কার, ট্র্যাডিশনাল কটেজ, স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট, পাঁচ তারকা হোটেল, থিম পার্ক, রিভার ক্রুজ, স্পিডবোট, হেলিকপ্টার, কনভেনশন হল, ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো সেন্টার, হসপিটাল, রিসার্চ ইনস্টিটিউট, স্টাফ রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, এগ্রি ট্যুরিজম, গ্রিন এনার্জি, পর্যটন ডিপ্লোমা কোর্স স্কুল প্রভৃতি। ব্লুরিভার আইল্যান্ড রিসোর্ট অ্যান্ড ট্যুরিজম ক্লাবের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যটন কেন্দ্রে প্রতিদিন লক্ষাধিক লোকের ভ্রমণের এবং ২০ হাজার পর্যটকের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা থাকবে। আশা করা হচ্ছে, এতে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। পর্যটনশিল্পের বিকাশে 'নাফ ট্যুরিজম পার্ক' গড়ে তোলার ঘোষণা নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এতে বিনিয়োগ করছে থাইল্যান্ডের বিখ্যাত সিয়ামসিয়াম ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি। ২৭১ একর জায়গাজুড়ে প্রায় ৪ হাজার ২০০ কোটি টাকার প্রকল্পটির ফলে ১২ হাজারের বেশি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২২ সাল নাগাদ পর্যটনশিল্প থেকে প্রতিবছর দুই ট্রিলিয়ন ডলার আয় হবে। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের ৫১টি দেশের পর্যটকেরা বাংলাদেশে ভ্রমণ করবেন, যা মোট জিডিপিতে ১০ শতাংশ অবদান রাখবে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালে মোট কর্মসংস্থানের ১ দশমিক ৯ শতাংশ হবে পর্যটনশিল্পের অবদান। তাই বলা যায়, পর্যটনশিল্পের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার রোল মডেল। ইতোমধ্যে পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনাকে লুফে নিয়েছে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, নেপাল, মরিশাস, মালদ্বীপসহ বেশ কিছু দেশ। কঠোর রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত চীন, ভিয়েতনাম, মিয়ানমারও পর্যটনশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে তাদের সীমান্ত দ্বারে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে অথচ একসময় তারা বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যাবসাবানিজ্যও বন্ধ রেখেছিল।

ইদানীং আমাদের দেশের পর্যটন খাতকে এগিয়ে নিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার ফলে ভ্রমণপিপাসুদের জন্য বাণিজ্যিক ট্রাভেল এজেন্সির বাইরেও গড়ে উঠেছে অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন প্ল্যাটফরম। ফেসবুকভিত্তিক বিভিন্ন ট্রাভেল গ্রুপে চোখ রাখলেই বোঝা যায় ভ্রমণের প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন কতটা বাড়ছে। বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ট্যুরিস্ট পুলিশের সহায়তার জন্য নিশ্চিন্তে বিশেষ বিশেষ ছুটিতে বেশি ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষ। বিশ্ব দরবারে পর্যটন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিচিতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বের দুটি বৃহৎ পর্যটন বিষয়ক স্টেজে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দানের সুযোগ পেয়েছে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার কমিশন ফর সাউথ এশিয়ায় ২০২১-২০২৩ মেয়াদে ভাইস চেয়ার নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়া আটটি মুসলিম দেশের জোট ডি-৮-এর সভাপতি এখন বাংলাদেশ। বিনোদন, পর্যটন, শ্রান্তি বিনোদন পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন, ইভেন্ট পর্যটন, ক্রীড়া পর্যটন, নৌ-পর্যটন, হাওর পর্যটন, ধর্মভিত্তিক পর্যটনসহ পর্যটনের সকল শাখাকে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে কাজে লাগিয়ে পর্যটক আকর্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে দেশি-বিদেশি বিপুলসংখ্যক পর্যটক বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ভ্রমণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ফাতেমা আক্তার : প্রাবন্ধিক

বিজ্ঞান বিষয়ক ওয়েবসাইটের যাত্রা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে 'বিজ্ঞানজগৎ' নামের একটি ওয়েবসাইট যাত্রা শুরু করেছে। 'সহজ ভাষায় বিজ্ঞান' –এই বার্তা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে ওয়েবসাইটটি। ওয়েবসাইটটির ঠিকানা হলো: www.bigganjagat.com।

বিজ্ঞান নিয়ে বাংলা ভাষায় তেমন একটা ওয়েবসাইট দেখা যায় না। তরুণ ও যুবকরা দিনের একটি বড়ো সময় এখন অনলাইনে কাটায়। নতুন প্রজন্মের মাঝে বিজ্ঞানের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে অনলাইন একটি বেশ কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানজগৎ ওয়েবসাইটটিতে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, মহাবিশ্ব, টেকসই বিজ্ঞান, মস্তিষ্ক, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বেশ কিছু লেখা রয়েছে। বিজ্ঞান জগতের ওয়েবসাইটটি যে কেউ www.bigganjagat.com এই লিংকে গিয়ে ভিজিট করতে পারবে।

প্রতিবেদন: নওশিন আহমেদ

বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস

সাক্ষরতা হোক অগ্রগতির সমন্বয়ক

প্রশান্ত দে

মানবজীবনের এক মূল্যবান সম্পদ শিক্ষা এবং এর সঙ্গে 'সাক্ষরতা' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাক্ষরতা শিক্ষার প্রথম সোপান। শিক্ষা ও সাক্ষরতা শব্দ দুটির মধ্যে রয়েছে মৌলিক ব্যবধান। সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষা। অন্যদিকে আভিধানিক অর্থে সাক্ষরতা হলো অক্ষর পরিচিতি, লেখা ও পড়ার ক্ষমতা। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয় পড়ে সেটা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে সাক্ষর বলে। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি উপায় বিদ্যমান। আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক। যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় তারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষরতা লাভ করে থাকে। তবে বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকটি দেশই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সাক্ষরতার হার বাড়াতে সচেষ্ট। একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত সে দেশের শিক্ষার হার ও সাক্ষরতার হার। একটা সময় মনে করা হতো যে দেশে যত বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, সে দেশ তত বেশি উন্নত। কিন্তু এখন ধারণা পালটেছে। এখন মনে করা হয়, যে দেশ যত বেশি শিক্ষিত এবং সাক্ষরতায় এগিয়ে, সে দেশ তত বেশি উন্নত। তাই আজকে মানবসভ্যতার যে অগ্রগতি আমরা অবলোকন করি, তা সবই সম্ভব সাক্ষর জ্ঞানের জন্য।

৮ই সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস'। প্রতিবছর একটি বিশেষ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। সারা বিশ্বে ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও সমাজের জন্য লেখাপড়ার গুরুত্ব ও ক্ষমতার বিষয়টি বোঝাতে এবং সাক্ষরতার গুরুত্ব তুলে ধরার জন্যই সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। পৃথিবীব্যাপী গত ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব সামগ্রিক জনসংখ্যায় সাক্ষরতা হার হলো ৮৪.১%। এ বছর স্বাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য– 'Transforming Literacy Learning Spaces' অর্থাৎ 'স্বাক্ষরতা শিখন ক্ষেত্রের প্রসার'।

১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে পৃথিবীর সব দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর ১৯৬৫ সালের ৮ থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর ৮৯টি দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষামন্ত্রী ও পরিকল্পনাবিদদের অংশগ্রহণে ইউনেসকোর উদ্যোগে ইরানের তেহরানে 'বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে প্রতিবছর ৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালনের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেসকো কর্তৃক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ১৯৬৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইউনেসকো প্রথম 'বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস' পালন করে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রথম 'বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস' পালন করা হয়। সাক্ষরতা বিষয়ে ইউনেসকো ১৯৬৭ সালে প্রথম সাক্ষরতার সংজ্ঞা প্রদান করে। সে সংজ্ঞানুযায়ী কেউ যদি তার নাম লিখতে পারে তাহলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো। কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে সাক্ষরতার সংজ্ঞা। ১৯৯৩ সালে ইউনেসকো সাক্ষরতাকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করে। বর্তমানে যিনি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য পড়তে পারবেন, বাক্য লিখতে পারবেন এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে পারবেন তাকে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন বলা হয়। এই প্রত্যেকটি কাজই হবে ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সারা বিশ্বে বর্তমানে এই সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে সাক্ষরতার হিসাবনিকাশ করা হয়।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা-পরবর্তী ১৯৭৪ সালের প্রথম আদমশুমারির তথ্যমতে, সেসময় সাক্ষরতার হার ছিল ২৬.৮%। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন সদ্য স্বাধীন দেশে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হলে জাতিকে প্রথমেই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে টিকে থাকতে পারে না। শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে তার ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। তারপর আসে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা। তাই স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৭৩ সালে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ ও অবৈতনিক করেন। এছাড়া একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল নতুন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ন করা। ১৯৭৪ সালের ৭ই জুন প্রকাশিত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নামে একটি অধ্যায়ে দেশে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনার ওপর

বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে 'বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি' গঠনের মাধ্যমে ১৮টি জেলায় ৬৮টি থানার ৩২৫টি গ্রামে গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয় এবং এর মাধ্যমে ১৮,০০০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলা হয়। সেসময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছিল কালো আইন দ্বারা। বঙ্গবন্ধু সেই আইন পরিবর্তন করে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। গণশিক্ষা বিস্তার তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বঙ্গবন্ধু দেশের প্রথম বাজেটে জরুরি ভিত্তিতে বরাদ্দ করেছিলেন আড়াই কোটি টাকা। তিনি সবসময়ই গণমুখী শিক্ষাকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এজন্যই ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কার্যকর হওয়া সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে তাঁর নির্দেশনায় একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত পর্যাপ্ত বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাঠদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সরকার ঘোষিত রূপকল্প–২০২১-এর অন্যতম লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এর আলোকেই সরকার 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' এবং 'ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' প্রণয়ন করে। বর্তমান সরকারের শিক্ষা খাতে বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিকে ভর্তির হার প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে, ঝরে পড়া এবং বাল্যবিয়ে কমেছে। বছরের প্রথম দিনে সকল প্রাইমারি, মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় বিনামূল্যে বই বিতরণ সারা বিশ্বে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। প্রাথমিকের এক কোটি ৩০ লাখেরও বেশি শিশু উপবৃত্তি পাচ্ছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও অর্জিত হয়েছে জেন্ডার সমতা। সরকার বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে দারিদ্র্যের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু হয় কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি, কিংবা কখনও প্রাথমিকে ভর্তি হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রোগ্রাম (পিইডিপি-৪)-এর আওতায় 'আউট অফ স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম' এসব শিশুদের দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসছে। সরকার ২০৩০ সালে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে। মেয়েদের জন্য সাত বিভাগে করা হয়েছে সাতটি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও। কারখানার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ২৪ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় স্থাপন করা হয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করার উদ্যোগ চলমান রয়েছে। সাক্ষরতার হার এ সরকারের আমলে বিগত বছরের তুলনায় বেড়ে হয়েছে ৭৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ, যা শিক্ষা অবকাঠামোতেও বিপ্লব সাধন করেছে। শিক্ষাবিদরা বলেন, বিনামূল্যের বই, উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিংসহ সরকারের নানা পদক্ষেপের ফলে শিক্ষা খাতে সুফল মিলছে এখন।

বর্তমান সরকার দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাক্ষরতা ও জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধিতে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে। এ আইনের আওতায় জীবন ও জীবিকায়ন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, উপানুষ্ঠানিক ধারায় বৃত্তিমূলক, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি সাক্ষরতা প্রদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)-তে জীবনব্যাপী শিক্ষার বৈশ্বিক ধারণার দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে সকল নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদানের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইসিটি বেইজড জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ৪-এ জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম উৎসাহিত করা হয়েছে। শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের পরিমাণ বেড়েছে। করোনা মহামারি সময়েও সরকার অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন চালিয়ে গিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের নিমিত্তে সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার ও সকল কমিউনিটি রেডিওতে 'এসো ঘরে বসে শিখি' শিখন কর্মসূচি চালু করে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ প্রণীত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' ও 'টেকসই উন্নয়নের জন্য আলোচ্যসূচি ২০৩০'-এর অন্যতম প্রধান একটি বিষয় হচ্ছে 'সাক্ষরতা'।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য বর্তমান সরকার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট ৮১ হাজার ৪৯৯ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে, যা সর্বমোট বাজেটের ১২ শতাংশ। এবারের সার্বিক বাজেটের আকার ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা।

এবছর দেশে ১৫-২১শে জুন ২০২২ সপ্তাহব্যাপী প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনশুমারির জরিপ কাজ করা হয়। ২৭শে জুলাই রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রথম ডিজিটাল 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২'-এর প্রাথমিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৭৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ এবং নারীদের সাক্ষরতার হার ৭২ দশমিক ৮২ শতাংশ। এই হার ২০১১ সালের আদমশুমারিতে ছিল ৫১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ছিল ৫৪ দশমিক ১১ শতাংশ এবং নারীদের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ।

সাক্ষরতা প্রসার কর্মসূচির জন্য ইউনেসকো বাংলাদেশকে ১৯৯৮ সালে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮' প্রদান করে। এছাড়াও 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি ও 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'সমূহ বাস্তবায়নের সাফল্যের জন্য ২০১৪ সালে ইউনেসকোর তৎকালীন মহাসচিব ইরিনা বোকোভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'শান্তি বৃক্ষ' পদক প্রদান করেন।

প্রশান্ত দে: প্রাবন্ধিক

দুর্নীতি স্লোগান

এসো মিলে গড়ি দেশ
দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ

তোমার জন্যে

আসলাম সানী

আজ আকাশে যত তারা– তোমার জন্যে,
জোনাকিদের ঝিকিমিকি–
চাঁদের যত জোসনা আলো
আঁধার নাশি যত ভালো
তোমার জন্যে,

খুব সকালে সূর্যোদয়ে
স্নিগ্ধ রোদের শুভেচ্ছা সব
সুপ্রভাতে তোমার জন্যে,
আজকে তোমার জন্মদিনে
মেঘের সকল উৎসর্গ
– তোমার জন্যে,
পাখির কূজন-কিচিরমিচির
শিশির ভেজা পঙ্‌ক্তিমালা-কাব্যগুলো
তোমার জন্যে,

আজ জগতে সদ্য ফোটা–
সজীব ফুলের সমারোহ
তোমার জন্যে,
মসজিদে-মন্দিরে-গির্জা-
পেগোডাতে প্রার্থনা সব
কল্যাণ হোক মঙ্গল হোক
জন্মদিনে আনন্দ সব তোমার জন্যে,

মাঠের শস্য-ফসল-মিলে উৎপাদনের
অগ্রযাত্রা-শান্তি-সমৃদ্ধি-ঐক্য
বাংলাদেশের গৌরব সব– তোমার জন্যে
তোমার শুভ জন্মদিনে দীর্ঘায়ু হোক
সত্য শুভ মানবতা– পুণ্য পরম সুস্থ জীবন
ঊর্ধ্বে তোলা বত্রিশ কোটি হাত তোমার জন্যে।

তোমার জন্মদিনের উপহার

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

তোমার জন্মদিনে আমাদের প্রাণঢালা আর্তি
শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও প্রীতির আর একগুচ্ছ লালপদ্ম
গ্রামবাংলার-মাঠ-বনানীর শ্যামল ছায়ার ছবি
তোমার শাড়ির আঁচলে দ্যাখো মাখামাখি করছে।

তোমার জন্মদিনে আমরা এলাম মাওয়া ও জাজিরায়
সেখানে তুমি পদ্মার দুকূলকে বন্দি করেছো একাকী
আমাদের দিয়েছো শত শত বছরের বেদনার মুক্তি
স্বর্ণালি সম্ভাবনার অপার দ্বার খুলেছো সারা বাংলায়।

তোমার জন্মদিনে তোমার কীর্তি এই স্বপ্নের পয়ার
আমাদের নিশ্বাসে বিশ্বাসে সেই লালপদ্মের রেণু–
অমর হয়ে থাকবে তোমার মমতায় ভরা ডালিতে
তোমার করতলে শত জনমের এই স্পর্ধিত উপহার।

শ্রদ্ধা জানাই প্রধানমন্ত্রী

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

জাতির পিতার কন্যা তুমি– শেখ হাসিনা নাম
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পিতৃপুরুষের ধাম।
পঁচাত্তরে পিতা হারিয়ে হয়েছি দিশেহারা
কে ধরবে দেশের হাল, কে ধরবে তার কারা।
দেশটা তখন পশুর দল, খাচ্ছে কুরে কুরে
তুমি তখন বিদেশ বিভূঁই ছিলে অনেক দূরে।
দেশে তখন চলেছিল– শকুনদের উৎসব
সোনার বাংলায় চলতে থাকে পশুর কলরব।
আকাশ তখন থমকে গেছে– আকাশে কালো মেঘ
আকাশ-বাতাসজুড়েই শুধু উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ।
কোথায় যাবে দেশের মানুষ ভেবে না পায় কূল
ঠিক তখনই আসলে দেশে– করলে না আর ভুল।
অশ্রুভেজা চোখে আসলে, সব হারানোর শোকে
পিতা, মাতা, ভাই হারানোর কত দুঃখ বুকে।
ভালোবেসে দেশের মানুষ, আর যে স্বদেশ ভূমি
এসব দুঃখ ভুলে গিয়ে, আসলে দেশে তুমি।
কিন্তু দেশের শকুনগুলো, চায় না তোমায় শেষে
গ্রেনেড হামলায় ভাসিয়ে দিলো– রক্তনদী দেশে।
তাতেও ক্ষান্ত হয়নি তারা, পুড়িয়ে মানুষ মারে
চায়নি তারা দেশের মঙ্গল, তাইতো বোমা ছাড়ে।
প্রাণটা তোমার কেড়ে নিতে– চাইলো কত বার
রক্ষা তোমায় করলেন প্রভু পরওয়ারদিগার।
তবুও সাহস নিয়ে তুমি চললে সম্মুখপানে
বাংলাদেশটা ভরিয়ে দিলে পাখির গানে গানে।
জাতির পিতার কন্যা তুমি– জাতির অহংকার
ছড়িয়ে পড়ছে খ্যাতি তোমার, বিশ্বের চারিধার।
দিন বদলের প্রত্যয়ে আজ, দীপ্ত স্বদেশ ভূমি
জননেত্রী, দেশের রত্ন– বিশ্বময়ী তুমি।
তোমায় পেয়ে ধন্য জাতি, ধন্য বাংলাদেশ
বইছে হাওয়া ঝিরিঝিরি– মুক্ত পরিবেশ।
ঝলমলে আজ তারার আকাশ, বইছে খুশির বিন
শ্রদ্ধা জানাই প্রধানমন্ত্রী– শুভ জন্মদিন।

শুভ জন্মদিন

নিকুঞ্জ কুমার বর্মন

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর আর দক্ষিণ
চারদিকে শুধু তোমার শুভ জন্মদিন।
জন্মদিন! জন্মদিন! শুভ জন্মদিন!

মানবতার জননী তুমি, বাংলার স্বপ্ন
বিশ্ব অবাক তোমার সুশাসনের জন্য
মুজিবের কন্যা তুমি নেত্রী আপোশহীন।
জন্মদিন! জন্মদিন! শুভ জন্মদিন!

পনেরোই আগস্ট হয়েছ তুমি স্বজনহীন
একুশে আগস্ট বেজেছিল যে মৃত্যুবিন
শত বাধা পেরিয়েও তুমি যে অমলিন।
জন্মদিন! জন্মদিন! শুভ জন্মদিন!

দুখি মানুষের প্রকৃত সুহৃদ

দেলওয়ার বিন রশিদ

তুমি অনন্য মহৎ কীর্তিমান
বাঙালি হৃদয়ে তোমার আসন
তুমিইতো দুখিজনের সহায়, আশ্রয়
গ্রামগঞ্জের যত সমস্যাপীড়িত মানুষজন
সবারই সান্ত্বনা তুমি,
দুখের পরিসমাপ্তি তুমিই
দুখি মানুষের তুমি প্রকৃত সুহৃদ,
তুমিতো দুখি মানুষের সুখের ঠিকানা।
আশাহত জীবনের নতুন আশা তুমি
তুমি কর্ম-উদ্যম, প্রেরণাদাত্রী, মমতাময়ী,
তুমি বাংলার মানুষের স্বপ্ন আশার প্রতীক,
তুমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা
দেশরত্ন শেখ হাসিনা,
তুমি বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত, মানবতার মা,
তুমিই কল্যাণ, দুখির ভালোবাসা
তুমি আঁধারে আলো,
তুমি নতুন দিন, সুখী বাংলাদেশ।

স্বপ্নে দেখা সোনার সেতু

শেলী সেলিনা

ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে
জাগলো নদী দূরে
প্রভাতপাখি ডাক দিয়ে যায়
মিষ্টি মধুর সুরে।
কোথায় আছো পরান কাকা
গোপাল সূর্যমুখী
রহিম সোমা বিন্তি শশী
মুখ করো না দুখি।

আর হবে না দুখের কারণ
পদ্মা নদী কারো ...
মন চাইলে পেরিয়ে সেতু
ওপার যেতে পারো।
আয়রে সবাই যাইরে ওপার
সোনার সেতু বেয়ে ...
সোনার সেতু বাঁধিয়ে দিলো
জাতির পিতার মেয়ে।

পদ্মা সেতু সেতু তো নয়
রংধনুকের সাঁকো ...
থাকবে না আর পথের ফারাক
যেই পারেতে থাকো।
শত যুগের স্বপ্নে দেখা
মনের রঙে আঁকা;
সত্য হয়ে এপার-ওপার
বাড়িয়ে দিলো পাখা।

দুখহরা পদ্মা সেতু
দেশের টাকায় গড়া;
বঙ্গকন্যার ম্যাজিক দেখে
অবাক বসুন্ধরা।

গভীর পদ্মার বুকে

রীনা তালুকদার

উড়ে চিল, মাছরাঙা, দোয়েল, শালিক, ময়না, টিয়া
ছয় অধিক কিলোমিটার জলের আকাশে
বঙ্গকন্যার চোখের মনিটরে বাঙালির স্বপ্ন ভাসে।

হেমন্তের নবান্ন ঘ্রাণে মউ মাতাল পদ্মা চরের বসতি
ব্যাকুল কল্লোলিত সলিলে প্লাবনের জোয়ার
বিপ্লব বুকে স্বপ্ন জাগানিয়া গানের সেতার।

স্বয়ং ঐশ্বর্য দিয়ে বাঙালিকে করেছে ঐশ্বর্যবান
গভীর চলতি পথ তোমার হাসুমণি তেমনি গভীর
পদ্মার বুকে লোকে হেঁটে যাবে বাস্তব হলো হবির।

পিতার স্বপ্ন নিয়ে বহু বহুদূর হেঁটে চলছে
আলো জ্বেলে দশদিকে সরাইছে আঁধার
দূরে গেছে কালো-মন কালো-হাত সকল বাধার।

হাসু

সপ্তিকা চক্রবর্তী

পিতা-মাতার স্নেহ-আদরে হাসু বড়ো হলো,
বাসবে ভালো যখন হাসু, পিতাই চলে গেল।
হাজার স্মৃতি নিয়ে পিতার কাটে দিনটি তাঁর,
কাজের মাঝেই ব্যস্ত, হলো যে গো জীবন পার।
দেখত যদি পিতা তোমার, তুমিই দেশের নেতা,
খুশি হতেন আজকে কত, মহান জাতির পিতা।
হাসু যে তাঁর দেশদরদি, দেশকে ভালোবাসে,
যোগ্য দেশনেত্রী সে যে সোনার বাংলাদেশে।
ভাবছে নেত্রী, বাঁচলো মানুষ শত বছর ধরে,
পিতা কেন নিলো বিদায় তাঁর হাসুকে ছেড়ে?
সবার মতোই তোমার তরে পিতার দোয়া আছে,
তাই তো নেত্রী সবার প্রিয় বাঙালিদের কাছে।
বাঙালি আর বাংলাদেশের একটি যে ঠিকানা,
দুঃখ-ব্যথায় সব ভুলে পাই নেত্রী শেখ হাসিনা।

সবকিছু আমাকে ছেড়ে যায়

মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন

আর কিছুক্ষণ পর নগর ঘুমিয়ে যাবে
আমার ঘুম আসে না
বৃক্ষের বয়স হলে শরীর থেকে পাতা ঝরে যায়
আমি এখন বয়সিবৃক্ষের মতন।
তবু চোখের তারায় জোনাক পোকা আলো ছড়ায়
কিন্তু বুকের ভেতর রাশি রাশি অন্ধকার ঘন হয়ে আসে।
আমার খুব ইচ্ছে করে তারুণ্যের অন্ধকারে ডুবে যেতে
আমার কল্পনার তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে
বুকের ভেতর তৃষ্ণা বাড়ছে
এখন আরও তীব্রতা নিয়ে ভালোবাসতে পারি
অথচ আমার মাথার উপর আকাশের শূন্যতা
চারপাশে বিরান অরণ্য–
আর কিছুক্ষণ পর নগর ঘুমিয়ে যাবে।

আদর্শলিপি

মনি হায়দার

কী হয়েছে তোমার?

বসার ঘরে গম্ভীরমুখে শাহাদাতকে বসে থাকতে দেখে অবাক জাহাঙ্গীর। কথা বলতে বলতে বসে পাশে। শাহাদাত হোসেন সরকারের বড়ো কর্মকর্তা। থাকে ঢাকায়। জাহাঙ্গীরের ছোটো বোনকে বিয়ে করেছে কয়েক বছর আগে। বিয়ের আগে শাহাদাত আর জাহাঙ্গীর বন্ধু ছিল। দুজনে মাস্টার্স করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জাহাঙ্গীর মাস্টার্স করে চাকরি না খুঁজে ভান্ডারিয়া উপজেলা শহরে ওষুধের বিরাট দোকান দিয়ে বসেছে। আরবান ফার্মেসি। প্রচুর বিক্রি হয় ওষুধ। বছর কয়েক আগে নিজের বাড়িতে বন্ধু শাহাদাতকে বেড়াতে এনেছিল জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের ছোটো বোন সূচনা তখন কলেজে বিএ পড়ে। সূচনার সঙ্গে শাহাদাতের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠলে দুই পরিবারের মধ্যে কথা চালাচালির মাধ্যমে তাদের বিয়ে হয়। সেই সূত্রে শাহাদাত হোসেন হচ্ছে জাহাঙ্গীর হোসেনের ছোটো বোনের স্বামী। ছোটো বোনের স্বামী হলেও দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব আগের মতোই প্রগাঢ়। হাসিঠাট্টায় চমৎকার বন্ধুত্ব দুজনের।

শাহাদাত শ্বশুরবাড়ি এসেছে পুবালি লঞ্চে। লঞ্চ যখন কাউখালি পার হয়ে হুলারহাটের দিকে যাত্রা করে তখন প্রায় দুপুর। কেবিনে একা একা ঝিমুচ্ছিল। হঠাৎ কানে আসে খুব পরিচিত মানুষের কণ্ঠস্বর– ভাই, আদর্শলিপি লাগবে? আদর্শলিপি?

মানুষটা বলে যেতে থাকে, আপনার নাতি-নাতনি, ছেলেমেয়েদের আদর্শলিপি কিনে দেন। আদর্শলিপিতে কত সুন্দর সুন্দর কথা লেখা আছে! ইক্ষু রস অতি মিষ্ট, ঈশ্বরকে বন্দনা কর, ঊর্ধ্ব মুখে পথ চলিও না...।

নিমিষেই ঝিমুনি কেটে যায় শাহাদাতের। দ্রুত কেবিনের বাইরে আসে। ইতোমধ্যে আদর্শলিপির ফেরিওয়ালা দোতলা থেকে নীচের দিকে চলে গেছে। লঞ্চের রেলিং ধরে এক মুহূর্ত ভেবে দ্রুত ফেরিওয়ালাকে অনুসরণ করে নীচে নামে। সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়ায়। ফেরিওয়ালা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বসা ক্লান্ত যাত্রীদের কাছে গিয়ে হাতের বই বাড়িয়ে ধরে, নেবেন ভাই আদর্শলিপি? বাড়িতে আপনার নাতি-নাতনি, ছেলেমেয়েদের হাতে আদর্শলিপি তুলে দিন। আদর্শলিপি পড়ে ওরা একদিন বড়ো আদর্শ নিয়ে বড়ো হবে। শুনুন, কত দামি কথা লেখা আছে আদর্শলিপিতে– ঊর্ধ্ব মুখে পথ চলিও না, ঈশ্বরকে বন্দনা কর...। দু'একজন যাত্রী বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখে। একজন কেনে। ফেরিওয়ালা খুব খুশি হয়ে ভাঙতি টাকা দিয়ে আবার ঘুরে অন্য যাত্রীদের দিকে যায়। কণ্ঠে সুরেলা আওয়াজ– নেবেন ভাই একটা আদর্শলিপি?

গোটা ঘটনা নিজের চোখে দেখে বিস্ময়াপন্ন শাহাদাত। কী করবে ভেবে পায় না কিছু। দেখে ফেরিওয়ালা ওর দিকেই আসছে। দ্রুত বিষণ্ন মর্মাহত শাহাদাত হোসেন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। লঞ্চ যখন তেলিখালিতে ভেড়ে ব্যাগ নিয়ে নীচে নেমে আসে শাহাদাত। চারদিকে তাকায় কিন্তু কোথাও আদর্শলিপির ফেরিওয়ালাকে দেখতে পায় না। কোথায় গেল?

জামাই মিয়া! আহমদ মাঝি শাহাদাতকে দেখেই কাদা ভেঙে তীরে এসে ব্যাগটা হাতে নেয়, আসেন। আমার নৌকায় আসেন। আহমদ মাঝি এলাকার মাঝি।

চলুন। জুতো জোড়া খুলে হাতে নিয়ে প্যান্ট গুটিয়ে নৌকায় উঠে বসে শাহাদাত। নৌকা ছেড়ে দেয় আহমদ মাঝি। কচা নদীতে জোয়ারের কাল। তেলিখালি থেকে বোথলা গ্রামে যেতে ঘণ্টা

খানেক লাগবে।

আহমদ প্রশ্ন করে, জামাই কি ঢাকা দিয়া আইচেন?

হ্যাঁ। টাপুরে নৌকার গলুইয়ে আসন গেড়ে বসেছে শাহাদাত।

চিঠি লেহেন নাই? বাড়ি দিয়া কেউতো আমারে কিছু কইলো না। আপনে আওনের আগে পেরতেকবারতো আমারে কইয়া দেয় আপনের শ্বশুর...। তয় উনি আইজকাইল বাড়িতে বেশি থাহে না। হাটবাজারে বই বেচে।

শাহাদাত উত্তরে কোনো কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। কচা নদীর স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া কচুরিপানা, উড়ে যাওয়া বকদের সারি দেখে। বিকেলে বাড়িতে পৌঁছে খাওয়া সেরে বসার ঘরে বসে ট্রানজিস্টারে আবদুল লতিফের গান শুনছে ঢাকা কেন্দ্রে– 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়... '।

এতদিন মানুষের মুখে শুনেছি– গম্ভীরভাবে বলে শাহাদাত, আজ নিজের চোখে দেখলাম–

কী দেখলে?

বাবা লঞ্চে বই বিক্রি করছে।

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যায় জাহাঙ্গীর, কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। আগেতো ভান্ডারিয়া উপজেলায় গিয়ে বই বিক্রি করত। আমি ওষুধের দোকান দেওয়ার পর নিষেধ করেছি। কয়েক দিন বাড়ি থেকে বের হতে দিইনি...। আমাদের এত টাকাপয়সা, মানসম্মান আর আমার বাপ দোকানে দোকানে গিয়ে বই বিক্রি করে। কী বই? আদর্শলিপি। মানসম্মান আর রইল না।

তুমি ভাবো দৃশ্যটা, আমি লঞ্চের কেবিনে বসে আছি। আর আমার শ্বশুর যদি ঢুকে বলতেন, ভাই একটা বই কিনবেন? আমি কী করতাম? আমার মরে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকত না।

কী করা যায় বাবাকে নিয়ে?

আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

জাহাঙ্গীর তাকায় শাহাদাতের দিকে, কী প্ল্যান?

বাবাকে কাচারি ঘরের বড়ো রুমটার মধ্যে আটকে রাখলে কেমন হয়? আর বাড়িতে যত আদর্শলিপি আছে সব লুকিয়ে রাখব খাটের নীচে। কয়েক দিন বাড়ি থেকে বের হতে না পারলে বই বিক্রির ব্যাপারটা থেমে যেতে পারে। তুমি কী বলো? শাহাদাত তাকায় জাহাঙ্গীরের দিকে।

আইডিয়াটা ভালো। কিন্তু লোকে শুনলে বলবে কী?

লোকে কী এখন ভালো কিছু বলছে?

তা বলছে না। কিন্তু আটকে রাখাটা কি ঠিক হবে?

আমরাতো বাবাকে সম্মানের সঙ্গে রাখব। রুমে পর্যাপ্ত খাবার থাকবে। বিছানা থাকবে। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে গল্প করব। মোটের উপর ওনার বই বিক্রির ব্যাপারটা ভুলিয়ে রাখা দরকার। কয়েক দিন বা মাস খানেক এভাবে রাখলে আমার ধারণা বই বিক্রির ব্যাপারটা ভুলে যাবেন– জোর দিয়ে বলে শাহাদাত।

ঠিক আছে, কালকে থেকেই বাবাকে কাচারি ঘরের বড়ো রুমটার মধ্যে রাখব। কিন্তু রাখলেইতো হবে না, তার সুবিধা-অসুবিধার দিকেও তো খেয়াল রাখতে হবে।

সেটা আমি রাখব, তুমি চিন্তা কর না। আমি আছিতো সাত-আট দিন। অন্তত এই কয়টি দিন আমি চোখে চোখে রাখতে পারব।

জামাতা এবং পুত্র নিজেদের মানসম্মান বাঁচাতে কফিলউদ্দিনকে কাচারি ঘরে আটকে রাখে। প্রথমে ওরা ঘরটায় সুন্দর চেয়ার-টেবিল, বিছনাপত্র দিয়ে সাজিয়েছে। বাথরুমে যাবার বদনা রেখেছে। খাবারের পানির কলস রেখেছে একটা। দুটি গ্লাস। সকালে উঠে কফিলউদ্দিন নাশতা সেরে আদর্শলিপি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে ভরে বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিয়েছে মাত্র, জাহাঙ্গীর এসে সামনে দাঁড়ায়, বাবা কোথায় যাচ্ছেন?

হাসেন ষাটোর্ধ্ব কফিলউদ্দিন, যাবো না মানে? আমিতো এখনই বের হচ্ছি। কত জায়গায় যেতে হবে তুই জানিস? জানিস না। তুরাগপাড়া প্রাইমারি স্কুলে আজ আমার আদর্শলিপি বিতরণের দিন। ফুলের মতো ছেলেমেয়েরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার কি দেরি করার সময় আছে?

যাবার আগে একটু কাচারি ঘরে আসবেন?

কাচারি ঘরে কেন?

শাহাদাত আপনার সঙ্গে কী একটা জরুরি কথা বলবে।

ও শাহাদাত! চল, ঢক ঢক করে পানি খেয়ে খালি গ্লাসটা রেখে ছাতাটা হাতে নিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ঢোকে কফিলউদ্দিন। শ্বশুরকে দেখে দাঁড়িয়ে যায় শাহাদাত। শরীরের খোঁজখবর নিয়ে শাহাদাত আর জাহাঙ্গীর এক সঙ্গে রুম থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়। হতভম্ব কফিলউদ্দিন জানালার সামনে এসে অবাক কণ্ঠে– এসব কী হচ্ছে বাবারা?

বাবা, আপনার বয়স হয়েছে। আপনি রাস্তায় রাস্তায়, লঞ্চে, বাসে, স্কুলে স্কুলে গিয়ে বই বিক্রি করেন, আমরা চাই না– কথা বলতে বলতে জাহাঙ্গীর তাকায় শাহাদাতের দিকে।

জি বাবা, জাহাঙ্গীর ঠিকই বলেছে। সমর্থন করে বলে শাহাদাত– আপনার খাওয়াপরার কি অভাব আছে? আপনি কেন বই বিক্রি করবেন? আজ থেকে আপনি এই ঘরে থাকবেন, খাবেন। সব আয়োজন থাকবে... আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে ডাকবেন, আমি সব পৌঁছে দেব। প্রথম একটু খারাপ লাগবে আপনার, পরে ঠিক হয়ে যাবে...। বাবা, আমরা যা করছি, আপনার ভালোর জন্যই করছি। কফিলউদ্দিন কয়েক মুহূর্ত নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন পুত্র ও জামাতার দিকে। গোটা ঘটনা করোটির ভেতরে নিয়ে যখন বুঝলেন তাকে বন্দি করা হয়েছে, তিনি বিবশ হয়ে গেলেন ভেতরে ভেতরে। পুত্র ও জামাতা যে ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল– চিৎকার চেঁচামেচি করবে, লোক ডাকবে, দরজায় কষাঘাত বা লাথি মারবে, তার কিছুই না করে কফিলউদ্দিন রুমের ভেতরে খাটের উপর বসলেন। মনটা অবশ। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। বন্দি পরিস্থিতিতে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। একবার মনে হয়, চিৎকার করে কাচারি বাড়ির ঘর-দরজা ভেঙে বেড়িয়ে সব গুড়িয়ে দিয়ে যেদিকে ইচ্ছা চলে যাবেন। কিন্তু নিজেকে নিজে থামালেন। পুত্র ও জামাতাকে একটি কথাও না বলে বিছানায় শুয়ে পরলেন। জাহাঙ্গীর এবং শাহাদাত অবাক হলেও খুশি হয়েছে, যাক বাবা কোনো ঝামেলা তৈরি করেননি। কয়েকটা দিন এভাবে থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বন্দি অবস্থার তিন দিন তিন রাত পার হয়েছে। কফিলউদ্দিন পুত্র বা জামাতার সঙ্গে কোনো কথা বলছেন না। নিয়মিত খাবার দিচ্ছে, তিনি খাচ্ছেন। সময় কাটানোর জন্য ট্রানজিস্টার দেওয়া

হয়েছে, কফিলউদ্দিন আগেও ট্রানজিস্টার শুনতেন। এখন বেশি সময় ধরে শুনছেন। তিন দিন পর এক সকালে জাহাঙ্গীর আর শাহাদাত উপজেলা সদর ভান্ডারিয়া চলে যায়। কফিল বিছানায় শুয়ে আছেন।

দাদু? এই দাদু? জাহাঙ্গীরের মেয়ে তৃণা জানালার ওপাশ থেকে ডাকছে। কফিল উঠে বসেন। চশমাটা চোখে দিয়ে দেখেন তৃণার সঙ্গে এসেছে শাহাদাতের ছেলে রজত। তৃণা পড়ে ফোরে। রজত পড়ে সিক্সে। দুজনার মধ্যে খুব ভাব। বিছানা থেকে নেমে কফিলউদ্দিন জানালার সামনে দাঁড়ান, কী দাদুরা? তোমরা কেমন আছ?

আমরাতো ভালো আছি। কিন্তু তোমাকে আটকে রেখেছে কেন নানাভাই? শাহাদাতের ছেলে রজত চটপট কথা বলে সবসময়।

গভীর বেদনামথিত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কফিলউদ্দিন বলেন, আমি যে আদর্শলিপি বিক্রি করি!

আদর্শলিপি বিক্রি করলে কী হয়? পালটা প্রশ্ন করে তৃণা।

শোনো তোমরা, তোমাদের বলি। কারণ তোমাদের বাবা-মা জানে না। জানতেও চায় না। আমি যখন তোমাদের মতো স্কুলে পড়ি, ঠিক ক্লাস ফোরে আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা, তখন আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল।

কারা কেড়ে নিতে চেয়েছিল, দাদু? জানতে চায় তৃণা।

পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসকেরা। শুরু হয় মায়ের ভাষা রক্ষার আন্দোলন। আমার বাবা শফিউদ্দিন ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। তখন ঢাকা থেকে পেপার আসত দুদিন পরপর। সেই পত্রিকা পড়ে এলাকাবাসীকে শোনাতেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনেক মানুষ এই অজ পাড়াগাঁয়ে মিছিল করেছিল। সবার সামনে ছিল বাবা শফিউদ্দিন। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে তিনি ভাবলেন দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে বর্ণমালা পৌঁছে দেওয়া দরকার। তখনতো আর এত মানুষজন ছিল না, ছিল না যন্ত্রপাতি। বাবা ঢাকা থেকে হাজার হাজার কপি আদর্শলিপি কিনে এনে বিলাতে লাগলেন হাটে, মাঠে আর স্কুলে। বিলাতেন আর বলতেন, আদর্শলিপির বর্ণ ও লেখাগুলো মুখস্ত করতে পারলে আমাদের সন্তানেরা কখনো ভুলে যাবে না। আর ভুলে না গেলে ধ্বংস করাও সম্ভব হবে না। বাজারে দোকান দিলেন 'ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি'। বাবা জানতেন, ভাষা বেঁচে থাকে বর্ণমালায়। সেই বর্ণমালা যদি একবার শেখা যায় কিংবা অসংখ্য শিশু-কিশোরদের শিখিয়ে দেওয়া যায়, কেউ ধ্বংস করতে পারবে না বাংলা ভাষা।

তারপর?

কফিলউদ্দিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, আমার বাবা মারা গেলে আমি 'ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি' চালাতে লাগলাম। লাইব্রেরির টাকায় তোদের মা-বাবাকে লেখাপড়া শিখালাম। বড়ো করলাম। আর এখন ওরা আমাকে বন্দি করে রাখে, চোখ ভিজে যায় জলে। আমি যদি আদর্শলিপি বিক্রি না করি কোথায় পাবে? আজকালতো কেউ আদর্শলিপি পড়তে চায় না। কিন্তু আমি চাই এদেশের ঘরে ঘরে আদর্শলিপি পৌঁছে যাক...।

দাদু?

ভেজা গলায় সাড়া দেন কফিলউদ্দিন, কী দাদাভাই?

তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমরা আসছি। তৃণা হাত ধরে রজতের। দুজনে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। কফিলউদ্দিন বিছানায় বসে ঝিমুতে শুরু করেন। অনেক দিন পর স্ত্রী সুফিয়াকে খুব মনে পড়ে। সুফিয়া থাকলে এত দিনে বাড়িতে লণ্ডভণ্ড বানিয়ে দিত। যা ভালোবাসতো কফিলউদ্দিনকে।

দরজা খুলে যায়। অবাক কফিলউদ্দিন, দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে তৃণা আর রজত। তৃণার হাতে তালা আর চাবি। রজতের হাতে আদর্শলিপির ব্যাগ।

দরজা খুললে কীভাবে?

বাবা চাবি রেখেছিলেন ড্রয়ারে, চুপি চুপি বলে তৃণা। সেখান থেকে নিয়ে এসেছি।

আর আদর্শলিপি লুকিয়ে রেখেছিল খাটের নীচে। সেখান থেকে নিয়ে এসেছি– বলতে বলতে রজত হাত ধরে নানার, চলো এখন।

কোথায় যাব?

আমরা দুজনে তোমার সঙ্গে ঘরে ঘরে আদর্শলিপি বিক্রি করব।

কফিলউদ্দিনের বুকের ভেতর হাজার হাজার বর্ণমালা নাচতে আরম্ভ করে, বাঁধভাঙা জোয়ারের উচ্ছ্বাস তার কণ্ঠে, সত্যি বলছ তোমরা?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। দেখি, আমাদের কে আটকায়? দাদার হাত ধরে তৃণা।

চলো।

তিনজনে বেড়িয়ে পড়ে রাস্তায়।

গ্রামের লোকেরা অবাক চোখে দেখছে, কফিলউদ্দিন হাতে আদর্শলিপি নিয়ে প্রায় দৌড়াচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে, লাগবে আদর্শলিপি? মনে রাখুন আদর্শলিপির চিরন্তন উপদেশ– ঔদার্য অতি মহৎ গুণ, ঔষধি গাছ পাকিলে মরে যায়, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ...।

নানার সঙ্গে দৌড়ায় রজত, হাতে আদর্শলিপি। চিৎকার করে চারপাশের মানুষদের বলছে, আপনারা বর্ণমালা নেবেন? বর্ণমালা! রফিকের সফিকের জব্বারের বর্ণমালা!

দুজনের একটু পেছনে তৃণা হাঁটছে আর বাতাসে পতাকার মতো আদর্শলিপি দোলাতে দোলাতে বলছে, আমার কাছে আদর্শলিপি আছে, বর্ণমালা আছে, স্বরে অ আছে, স্বরে আ আছে, আপনারা কি নেবেন? আসুন, আমার কাছে।

পথের মানুষ তাকিয়ে থাকে আদর্শলিপির ফেরিওয়ালাদের দিকে।

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

আসুক ফিরে নতুন সাজে

সুফি মোশারফ

প্রত্যয় দীপ্ত আকাশে ভেসেছিল
কেবল একবার, সূর্য-সন্তান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
দুর্ভাগারা পারেনি ধরে রাখতে;
ধূমাচ্ছন্ন করেছে প্রদীপ্তি,
আজ আবার ক্ষীণ আভা দেখি
প্রভু হে, জাগাও ধরে রাখার শক্তি।
দুর্জনেরা রটায় আকাশকুসুম
একাকার করেছে সূর্য আর হারিকেন
ভুলেছে প্রদীপ, ভুলেছে সেঁজুতি
তাকায় না রোদনভরা মোহন বিশ্বপানে
অহেতুক মায়াকান্নার ফাঁদ ফাঁদে,
হে রাব্বুল আলামিন–
'অবুঝদের বোঝাও
বিশ্ব থেকে মহাবিশ্ব বড়ো
গোবর পদ্ম থেকে জলপদ্ম'
হটাও জুজুবুড়ির জোয়াল
দুষ্ট গরু;
সেও ভালো শূন্য থাকুক গোয়াল।

জীবনের জেদ

হাসান হাফিজ

চশমা ও চোখের মধ্যে
বন্ধুতা ক্রমেই বাড়বে
সায়াহ্নের এমনই নিয়ম
চোখের ক্ষমতা শুকনো ক্ষীয়মাণ
এ রকমই ক্ষতির নিয়তি
কমতে কমতে নিভতে নিভতে
তলানিতে এসে ঠেকতে চায়
দৃষ্টিশক্তি শুধু নয়
একইসঙ্গে কমে আসছে আয়ুর সীমাও
সীমিত স্বপ্নের মধ্যে সুতরাং
এলোমেলো হাবুডুবু চিৎসাঁতার
নাকেমুখে অনাত্মীয় জলঝঞ্ঝা
নিরুপায় হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি
শরীরের মধ্যে থাকা তেজ শক্তি
রোগব্যাধি প্রতিহত করবার
ক্ষমতা মিইয়ে যাচ্ছে দূরত্বে দ্বিধায়
ভাটার লেগেছে মহাটান
শেকড়-বাকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবে একটানে
হার তবু মানতে চায় না অজেয় জীবন।

মেয়েটির সব ছিল

গাজী সাইফুল ইসলাম

মেয়েটির সব ছিল ভাইবোন মাবাবা আদর
সোহাগের ঘর গেরস্থালি আর সুরভিত নদী
একক উঠোনে এক কোণে লাউ শিম কাকরোল
অন্যকোণে কাগজি লেবুর থোকা মিষ্টি গন্ধ।

মেয়েটির সব ছিল খোপভরা কবুতর বাক-বাকুম
দোয়েলের শিস চড়ুইয়ের কিচিরমিচির দুপুর
অলস ঘুঘুর একটানা ডেকে যাওয়া নিবিড় সন্ধ্যা
সামনের এক চিলতে বাগানে দুধরং রাজগন্ধা।

মেয়েটির সব ছিল আলমারি ভরা বহুবিধ রং
হরেক ডিজাইন লেসফিতা শেষ মডেলের জুতা
সুরেলা কণ্ঠের নিজস্ব সংগীত গাইতো মাঝেমধ্যে
রাজ্যের সুন্দর সব চিন্তা অসাম্প্রদায়িক হৃদয়।

কিন্তু হঠাৎই কী যে হলো তার, একটি বখাটে
বাঁশি কোথা থেকে আসি তার অন্তরের কোণে
জ্বাললো আগুন– এরপর সেটি আশপাশ পুড়ে
ছড়িয়ে পড়ল দিক দিগন্তের মুখ থেকে মুখে।
মেয়েটি বা হারালো মাবাবা ঘরগেরস্থালি
তার স্বপ্ন ধোয়া দুচোখের জল এখন ভেজায়
অহর্নিশি কংস তীরের মল্লিকা কদমের তল।

সম্প্রীতির নদীতীর্থ

পীযুষ কান্তি বড়ুয়া

অরূপ পাহাড় হতে ছুটে আসে সম্প্রীতির নদী
সমতলে অভিষেকে স্রোতোধারা হল জনপদী
কালুঘাট সেতু হতে প্রীতিময়ী যাবে সে সাগরে
পরমের পানে ছোটা স্রোত আর ফিরবে না ঘরে।

নদীর উদার বুকে মানুষের সর্বতীর্থ যেন
শৈশবে বুঝিনি তীরে দুর্গার মূর্তি ভিড়তো কেন
ঐ তীরে মণ্ডপের বাদ্য আসে এপারের কানে
এপারের আহ্বান শোনা যেত ওপারে আজানে।

নদী পার হয়ে রাধা ছুটে যায় পীরের মাজার
নিয়ে আসে পানি পড়া স্বামী মানে মানত খাজার
গ্রামে আসে নদীপথে পাদ্রিদের বিরাট বহর
চোখে যারা কম দেখে নিয়ে যাবে তাদের শহর।

ঈদের নামাজ শেষে দল বেঁধে এপাড়া-ওপাড়া
সেমাইয়ের নাশতায় পেট ভরে অলকা-রূপারা।
কোজাগরী পূর্ণিমায় বাটিভরা গুড়ের সন্দেশ
গফুর আমেনা খেয়ে বলে, 'আরো যদি বোন দ্যাস্'!

মাঝে মাঝে মানুষের রূপ ধরে এসেছে শয়তান
তাদের এড়িয়ে তবু সম্প্রীতির গাই জয়গান
এই ভাবে যুগে যুগে গলায় মিলিয়ে গলা হেসে
সম্প্রীতির নদী হয়ে বাঙালিরা আছে এই দেশে।

তোমার সারল্য: সরল কোণের

হাসান আলীম

শীর্ষবিন্দু থেকে সোজা দৃঢ় পায়ে মাথা উঁচু করে
ভূমিতে পা দাও–
তুমি ছোটো হয়ে যাবে না কখনো
তোমার ভূমিকা, ভূমি পদস্পর্শে দুটো কোণ হবে,
দুটো বাড়ি হবে–
বাড়ি দুটো কারো নয়
বরং তোমারই, তোমার পদধূলি!

দুটো ঘরেই সমতা হবে
তুমি সৃষ্টি করবে সারল্য অনন্য
ত্রিকোণের যোগাযোগে পাবে সরলতা, সরল কোণ মমতা।
ভূমি রেখার সরল অঙ্কে জ্যামিতিক ভালোবাসা
তোমাকে দেবে সমতা,

দেখ সকল মানুষ সমান সমান
কোনো ভেদাভেদ নেই
ত্রিভুজে ত্রিভুজে নেই জটিলতা
সরল কোণের ভালোবাসা
কী অবাক কী মধুর সুন্দর!

বাতাসের মূল্য

আবু নাসের সিদ্দিক তুহিন

বাতাসের গতিবিধিতে নেই কোনো বাধা সে স্বাধীন
শ্বাস নিয়ে মানবকুল, বেঁচে আছে সকল প্রাণিজগৎ
বাতাসের কষ্ট নেই, নেই কোনো অহংকার স্বার্থপরতা
প্রকৃতি সবুজ বৃক্ষের আড়ালে নির্মল বাতাস বিলিয়ে।

মানুষের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অশুভ সংকেত চারদিকে
সবুজ অরণ্য ধ্বংস করছে একদল অভিলাষী যাত্রী
কংক্রিট লোহালক্কড় কলকব্জা যান্ত্রিকতাবাদের যাত্রা
মনুষ্য প্রজাতির উৎপত্তি থেকে আজোবধি ধ্বংসাত্মক।

বাতাস শূন্য হচ্ছে পৃথিবীর দেহ, মানুষের শ্বাসকষ্টে
বিমূর্ত ক্রিস্টালের রূপ দিন দিন ভয়ংকর ফ্যাকাসে হচ্ছে
নিয়মটাকে অনিয়ম বানিয়ে, মস্তিষ্কের হাতুড়ির শব্দ সুর
অক্সিজেনের অভাব পৃথিবীর শ্বাসকষ্ট বেড়েই চলছে।

যার বাতাসের চাহিদা, সেই শুধু বুঝতে পারে বাতাস কী
জীবনের পাতায় রঙিন স্বপ্ন বিলুপ্তির পথে বাতাস শূন্যে
শ্বাসকষ্ট পৃথিবীর মানুষকে বাঁচতে শেখায় জীবন পণে
মূল্যহীন অবহেলিত বাতাস আজ কতই না মূল্যবান।

জীবনের একগুচ্ছ সামাজিক বাতাস শান্তির পরশ
বাতাস বেঁচে থাকার জন্য কতটা মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য
বাতাসের কষ্ট আজ লাখো মানুষের মূল্যবান চাহিদা
ইনহেলার, নেবুলাইজার পেরিয়ে এখন দরকার অক্সিজেন।

আশার পাল

প্রত্যয় জসীম

সমুদ্রের ঢেউ দেখে শিখেছি
থেমে থাকা জীবন নয়
অন্তহীন এ জীবন সমুদ্রে
ছোটো-বড়ো ঢেউ থাকবে

মাঝিদের দেখে শিখেছি
উত্তাল সাগরে যত ঝড়-তুফান আসুক
হাল ছেড়ে দেওয়া নয় ...
আরও গভীর প্রত্যয়ে
শক্ত হাতে ধরতে হবে হাল।

ঝড়-তুফান আসবে-যাবে
আশার সাগরে নাও ভাসবে
ধরে রেখো হাল
উড়াও আশার পাল।

দুঃখ নামের পাখি

আনসার আনন্দ

দিনের শেষে যখন পৃথিবী ঘুমায়
ফুরিয়ে যাওয়া সময় থেকে
জীবনের সঞ্চয় থেকে
জেগে উঠে দুঃখ পাহাড়।

চোখের আলোয় নক্ষত্রের বর্ণমালা
ছায়া হয়ে ছায়ার ভেতর ডুবে যায়
দুঃখ দুঃখ দিন
দুঃখ দুঃখ রাত।

দিগন্তের ওপারে যেখানে
আকাশ ছুঁয়ে যায় মাটি
মাটির ওপারে মাটি
শেষ পর্যন্ত একটি সংখ্যা ...

অনন্ত শূন্যতায় হারিয়ে যায়
আমার দুঃখ নামের পাখিটা।

ফিরে যাবো

সোহানা আকতার

অনেক দিন ধরে দেখি না আমি পল্লি মায়ের কোল
যেথায় আমার কেটেছে শৈশব নিত্য খেতাম দোল।
বাড়ির উঠোনে জোছনা তিমিরে লুকোচুরি খেলা
গাছের ডালে রশি লাগাতাম বন্ধুরা দিত ঠেলা।
সুপারির খোলে টেনে টেনে নিয়ে যেত বহুদূর
এমনি কেটেছে আমার শৈশবের সকাল-দুপুর।
মাঝে মাঝে এখন ভিড় করে মনে জাগায় ভীষণ ঘোর
ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে দেখি স্মৃতিময় ভোর।
লেবুগাছে আর চালতা-তলায় ভূত দেখতাম কল্পনায়
ভূতেরা সব ছায়া হয়ে আসত বাবা শোনাত গল্প হায়।
সেই সব স্মৃতি আজও ডাকে এখনও টেনে নেয় পিছন
ভাল্লাগে না আর এই শহর ইট বালি আর পাথর জীবন।
কবে আমি মুক্ত হবো আর পাখির মতন উড়বো
ফিরে যাবো আমি মায়ের কোলে, দেখবো আর ঘুরবো।

বাংলায় গড়ি দেশ

পারভীন আকতার

বাংলা মোদের বর্ণমালা
মনে দিলাম ঠাঁই,
কলমে করি প্রতিবাদ যত
বাংলায় শান্তি পাই।

সোনার বাংলা গড়তে হলে
বাংলা শিখা চাই,
বাংলায় মজি বিশ্ব সাজি
বাংলা চর্চা চাই।

রক্ত দিয়ে বাংলা পেলাম
মায়ের বুলি মধু,
মায়ার কানন মিষ্টি শাসন
বাংলা রচি শুধু।

দেশের মাটি নিখাদ খাঁটি
বাংলা ভাষায় টান,
বাঙালি যেথায় থাকে আসীন
জয় বাংলা গান।

দেশ মোর মায়ের মতো
ভাষা সুশ্রী বেশ,
সবুজ-শ্যামল মায়া ঘেরা
সোনার বাংলাদেশ।

ঋতুরানি

আহসানুল হক

সাদা মেঘের শামিয়ানা
আকাশজুড়ে টানা
দিঘির জলে ভাসতে থাকে
ছোট্ট হাঁসের ছানা!

প্রকৃতিও দেয় ঢেলে দেয়
রূপ যে ষোলো আনা
শরৎ দৃশ্যে মন খুশিতে
সত্যি যে আটখানা!

শিউলিতলা যায় ভেসে যায়
খইয়ের মতো ফুলে
সাদা কাশের বন দুলে যায়
নদীর কূলে কূলে!

দিঘির জলে বিম্বিত হয়
নীল আকাশের ছবি
এমন দৃশ্যে মুগ্ধ বুঝি
শিল্পী এবং কবি!

মালার মতো পাখির সারি
ফিরে নীড়ে সাঁঝে
শরৎ হলো ঋতুর সেরা
ষড়ঋতুর মাঝে !

দেশবন্ধু শেখ হাসিনা

নাসিমা আক্তার নিঝুম

বঙ্গবন্ধুর কন্যা তিনি
শেখ হাসিনা নাম
বিশ্বজুড়ে আছে তাঁর
হাজারও সুনাম।

পদ্মা সেতু পায়রা বন্দর
তাঁর হাতে সব করা
দেশবন্ধু শেখ হাসিনা
যায় না তাঁকে ধরা।

তাঁর হাতে বাংলাদেশ
আছে উন্নয়নের চাবি
স্বপ্নগুলো সফল হোক
এই আমাদের দাবি।

কাশের বনে

অপু বড়ুয়া

নদীর পাড়ে কাশের বনে
বাতাস করে খেলা
মনটা আমার থির থাকে না
মিষ্টি বিকেলবেলা।

মন ছুটে যায় নদীর পাড়ে
কাশের বনে হারাই
খঞ্জনাদের নাচন দেখে
থমকে খানিক দাঁড়াই।

দারুণ খেলা ছুটোছুটি
ঘাসফড়িঙের পিছে
শরৎ কালের আনন্দটা
যায় না আমার মিছে।

শরৎ ঋতু

মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

শরৎ ঋতুর প্রতিটি ছাপ
ঘাসের গতরজুড়ে
কাশফুলেরা হাতছানিতে
ডাকছে বহুদূরে।

ঘাসের পাতায় শরৎ ঋতু
করছে মাখামাখি
মন ভরে যায় দৃশ্য দেখে
জুড়ায় দুটি আঁখি।

পুবের বায়ু কাশের বনে
দোল দিয়ে যায় রাতে
কুয়াশাতে গতর ভিজে
শরৎ ঋতুর সাথে।

শরৎ ঋতু সবার প্রাণে
ঢেউ ছাড়া এক নদী
নানান ফুলের সমাহারে
চলছে নিরবধি।

শহিদ শেখ কামাল দেশের খেলাধুলা ও সংস্কৃতি জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, শহিদ শেখ কামাল দেশের খেলাধুলা ও সংস্কৃতি জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। পড়াশোনা, সংগীতচর্চা, অভিনয়, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা থেকে শুরু করে বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। স্বাধীনতার পর শেখ কামাল বন্ধুদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের হাতে ১৭ই আগস্ট ২০২২ বঙ্গভবনে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল 'সুপ্রিম কোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১' পেশ করেন– পিআইডি

করেন নাট্যদল 'ঢাকা থিয়েটার' এবং আধুনিক সংগীত সংগঠন 'স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠী'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া ও নাট্যাঙ্গনে তিনি ছিলেন সুপরিচিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া সংগঠক। প্রকৃতপক্ষে শেখ কামাল ছিলেন একজন ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমনা সুকুমার মনোবৃত্তির মানুষ। আবাহনী ক্রীড়া চক্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি দেশের ক্রীড়াজগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা ও নিজস্ব ক্রীড়া ভাবনায় এদেশে আধুনিক ফুটবলের পথিকৃৎ তিনি। খেলাধুলার সব শাখাতেই ছিল তাঁর মুনশিয়ানার ছাপ। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের অগ্রযাত্রা অনেকটাই স্থিমিত হয়ে পড়ে। ৫ই আগস্ট শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, ক্রীড়ানুরাগী, সংস্কৃতিমনা, তারুণ্যদীপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল মহান মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেছেন। কীর্তিমান এ তরুণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ক্রীড়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত বছর থেকে 'শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কারপ্রাপ্ত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব কেবল জাতির পিতার সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত। দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব সেই কঠিন দিনগুলোতে ছিলেন দৃঢ় ও অবিচল। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন তিনি। তাঁরই পরামর্শে বঙ্গবন্ধু হৃদয় থেকে উৎসারিত অলিখিত এ ভাষণ প্রদান করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দি অবস্থায় পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা তাঁকে বঙ্গমাতায় অভিষিক্ত করেছে।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পত্নী হয়েও সবসময় সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। নির্লোভ, পরোপকারী ও নিরহংকার মুজিবপত্নীর মাঝে বাঙালি মায়ের চিরন্তন প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। ক্ষমতার চূড়ায় থেকেও তিনি অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহারে সবাইকে আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে নিজ জীবনে লালন ও ধারণ করে তাঁর সন্তানদেরকেও একই আদর্শে গড়ে তোলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও একই শিক্ষা, আদর্শ ও চেতনাকে অবলম্বন করে বাংলাদেশকে আজ বিশ্বের বিস্ময়, উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলেছেন। ৮ই আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

জন্মাষ্টমী হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জন্মাষ্টমী হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পরোপকারী প্রেমিক, রাজনীতিক ও সমাজ সংস্কারক। সমাজ থেকে অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন ও হানাহানি দূর করে মানুষে মানুষে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মূল দর্শন। যেখানেই অন্যায়-অবিচার ও ধরাধামকে গ্রাস করেছে সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন আপন মহিমায়। সনাতন ধর্ম মতে, অধর্ম ও দুর্জনের বিনাশ এবং ধর্ম ও সুজনের রক্ষায় তিনি যুগে যুগে পৃথিবীতে আগমন করেন। অপশক্তির হাত থেকে শুভশক্তিকে রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মথুরার অত্যাচারী রাজা কংসকে হত্যা করে মথুরায় শান্তি স্থাপন করেন। কৃষ্ণের প্রেমিকরূপের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বৃন্দাবন লীলায়, যা বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল প্রেরণা।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের মহান ঐতিহ্য। জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে সকলকে সম্মিলিতভাবে সমাজে বিদ্যমান সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য অটুট রাখতে হবে। করোনা মহামারি ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ-সংঘাতের কারণে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি এখন ঊর্ধ্বগতি। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এর ফলে নিম্ন আয়ের মানুষ নানা সীমাবদ্ধতার মাঝে দিনাতিপাত করছে। আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনকে ধারণ করে পরোপকারের মহান ব্রত নিয়ে সমাজের অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলের প্রতি আহ্বান জানাই। ১৮ই আগস্ট শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কাজ করুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলাটাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য উল্লেখ করে নবীন বিসিএস কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, আমি চাই তরুণ অফিসাররা তাদের মনন ও বুদ্ধিমত্তাকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে কাজ করবে। তারা দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতেও বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। ২২শে আগস্ট বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সাভারে আয়োজিত বিসিএস কর্মকর্তাগণের ৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশনসহ আরও ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সেভাবেই আপনারা কাজ করে যাবেন। আমি চাই দেশের মানুষ উন্নত জীবন পাবে, সুন্দর জীবনের অধিকারী হোক এবং সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনের নবীন কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে আরও বলেন, জনগণের সেবায় নিবেদিত ও দক্ষ এবং পেশাদারি মনোভাব সম্পন্ন জনপ্রশাসন গড়ে তোলাটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কেননা তিনি চান জনগণ যেন সবকিছুতে সম্পৃক্ত থাকে, সেজন্য মন্ত্রণালয়ের নামটিও তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, জনগণের সেবা দেওয়াটা আমাদের সবার সাংবিধানিক কর্তব্য– এটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে। কাজেই জাতির পিতার সেই আদর্শ ধারণ করেই আপনারা কাজ করবেন। এবারের কোর্সে ১১৯ জন নারীসহ মোট ৪৬১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন।

জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে রক্ষিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর প্রধানমন্ত্রী এই মহান নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি সুসজ্জিত চৌকস দল জাতির পিতার প্রতি রাষ্ট্রীয় সালাম প্রদান করে। বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডে শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর প্রধানমন্ত্রী ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডে জাতির পিতার ঐতিহাসিক বাসভবন পরিদর্শন করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বনানী কবরস্থানে শায়িত ১৫ই আগস্টে নিহতদের কবরেও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারযোগে বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া পৌঁছান। সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাত করেন।

একনেকে প্রায় ২ হাজার ৭ কোটি টাকার ৭টি প্রকল্প অনুমোদন

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় ২ হাজার ৭ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৭টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ১ হাজার ৮৩১ কোটি ৪১ লাখ টাকা, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৫৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক অর্থায়ন ১২২ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। প্রধানমন্ত্রী এবং একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ২রা আগস্ট গণভবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেকের সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের 'কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহের (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প; কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে 'Procurement of Equipment and Machineries from Belarus for Selected Municipalities and City Corporations' প্রকল্প; গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের 'উত্তরা লেক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প; ডাক ও

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই আগস্ট ২০২২ ঢাকায় বনানী কবরস্থানে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টে শাহাদতবরণকারী বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য শহিদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন– পিআইডি

টেলিযোগাযোগ বিভাগের 'ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় টেলিটকের নেটওয়ার্ক বাণিজ্যিকভাবে ৫জি প্রযুক্তি চালুকরণ' প্রকল্প; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 'ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন' প্রকল্প; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প যথাক্রমে 'ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ' প্রকল্প এবং 'কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী' প্রকল্প।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

জনগণের শক্তিতে বলীয়ান আওয়ামী লীগ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আওয়ামী লীগ কোনো বিদেশি শক্তির শক্তিতে বলীয়ান নয়, আমরা বাংলাদেশের জনগণের শক্তিতে বলীয়ান। সমস্ত বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১৫ই আগস্ট ২০২২ ঢাকায় তথ্য ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্মরণসভায় মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন– পিআইডি

আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। ভারত আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি বলেন, এই দেশে গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক শক্তির নেতৃত্ব দিচ্ছে আওয়ামী লীগ। সুতরাং যারা অগণতান্ত্রিকভাবে বন্দুকের নল থেকে বের হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে, তাদের সাথে গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক বিশ্ব থাকতে পারে না। ১৯শে আগস্ট চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের বঙ্গবন্ধু হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড : পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি' শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসাইনকে জবাই করা হয়েছিল। কিন্তু কারবালার প্রান্তরে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হয়নি, তাঁদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অথচ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নারী এবং শিশুদের হত্যা করা হয়েছে। ১০ বছরের শিশু শেখ রাসেল, চার বছরের সুকান্ত বাবু, ১১ বছরের বেবি সেরনিয়াবাতকে হত্যা করা হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা বেগম আরজু মণিকে হত্যা করা হয়েছে। সেদিন প্রকৃতপক্ষে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ডের সকল কুশীলব ও এর পটভূমি রচয়িতাদের মুখোশ উন্মোচন ও বিচারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঠিক ইতিহাস জানানো আমাদের দায়িত্ব।

বঙ্গবন্ধু যেমন গণমাধ্যমকে ভালোবেসেছেন, গণমাধ্যমও বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বঙ্গবন্ধু যেমন গণমাধ্যমকে ভালোবেসেছেন, গণমাধ্যমও তেমনি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছে। বঙ্গবন্ধু প্রচণ্ড গণমাধ্যমবান্ধব ছিলেন এবং তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনেক। ১৮ই আগস্ট রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) প্রাঙ্গণে দীপ্ত টিভি এবং বিএফডিসি আয়োজিত চারদিনব্যাপী 'গণমাধ্যম ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক দুর্লভ আলোকচিত্র ও '১৫ আগস্টে দুই বাড়ি' তথ্যচিত্র প্রদর্শনী উদ্‌বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, অনেকে পঁচাত্তর সালে চারটি সংবাদপত্র রেখে বাকিগুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা বলেন, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত ছিল সাময়িক এবং অনেকে হয়ত জানেন না, কোনো পত্রিকার কোনো সাংবাদিক তখন বেকার হননি। তথ্য দফতরের মাধ্যমে প্রত্যেককে সরকারি বিভিন্ন বিভাগে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর মতো বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও অত্যন্ত গণমাধ্যমবান্ধব। তাঁর নেতৃত্বে দেশে গণমাধ্যমের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। তাঁর হাত ধরেই দেশে বেসরকারি টিভির যাত্রা শুরু। এরপর ২০০৯ সালে আবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার সময় ১০টি টিভি ছিল। এখন ৪৫টি। ৩৮টি সম্প্রচারে আছে, শীঘ্রই আরও সম্প্রচারে আসছে। বেসরকারি এফএম, কমিউনিটি বেতারও বঙ্গবন্ধুকন্যার হাত ধরেই এসেছে, দেশে দৈনিক পত্রিকা ১২শোর বেশি।

অনেক উন্নয়নশীল এমনকি অনেক উন্নত দেশের চেয়েও বাংলাদেশে গণমাধ্যম অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পাশাপাশি গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা অতীব প্রয়োজন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পটভূমি তৈরিতে যেমন অপসাংবাদিকতা ভূমিকা রেখেছে, বাসন্তীকে জাল পরানো ছবি ছেপে এবং এমন অনেক মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়েছে, তেমনি এখনো কিছু কিছু গণমাধ্যমে তেমন চর্চা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি সংকটের কথা এড়িয়ে গিয়ে শুধু দেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ে সংবাদ দিলে তা ঠিক সাংবাদিকতা হয় না বলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। তিনি বলেন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে হাতে গোনা কয়েকটি টিভি আর পত্রিকা। মালয়েশিয়ায় সকল টিভির ফিড একটি ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে যায়, কোনো বিতর্কিত বিষয় থাকলে ফিল্টার করা হয়, আমাদের দেশে তা হয় না। অসত্য সংবাদ পরিবেশনের জন্য *বিবিসির* একটি সেকশনের পরিচালকসহ সবাইকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। অসত্য সংবাদ পরিবেশনের ফলে মামলায় কয়েক বিলিয়ন ডলার জরিমানা না দিতে পেরে ১৩০ বছরের পুরনো ব্রিটিশ পত্রিকা *নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড* দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। ইউরোপ-আমেরিকায় ভুল বা অসত্য সংবাদ পরিবেশন করলে বিশাল অঙ্কের জরিমানা হয়, আমাদের দেশে হয় না। আমাদের দেশে গণমাধ্যম অনেক বেশি স্বাধীন।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

১০ শিক্ষার্থীর জন্য থাকবে এক শিক্ষক

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে প্রতি ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকার বাধ্যবাধকতা রেখে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নতুন আইনের খসড়া সংসদে পাস হয়েছে। ২৯শে

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৩০শে আগস্ট ২০২২ ঢাকায় মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২০২৩-২০৩১ বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা কলেজের জন্য জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা শীর্ষক কর্মশালায় বক্তৃতা করেন– পিআইডি

আগস্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ বিল ২০২২' সংসদে পাসের প্রস্তাব করেন। পরে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। এর আগে বিলের ওপর দেওয়া জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে পাঠানো এবং সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর নিষ্পত্তি করেন ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু।

নতুন আইন অনুযায়ী, মেডিকেল কলেজের নামে অন্যূন ৩ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের নামে ২ কোটি টাকা যে-কোনো তফসিলি ব্যাংকে সংরক্ষিত থাকতে হবে। এরইমধ্যে স্বীকৃতি পাওয়া মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের নামে এক কোটি টাকা জমা থাকতে হবে। তবে ৫০ আসনের বেশি অতিরিক্ত প্রতি আসনের জন্য মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে ৩ লাখ টাকা এবং ডেন্টাল কলেজের জন্য ২ লাখ টাকা সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে জমা থাকতে হবে। ব্যক্তি নামে মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে আরও এক কোটি টাকা সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে জমা থাকতে হবে। আইন অনুযায়ী, প্রত্যেক বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের সব শিক্ষার্থীর ভর্তি ফি সরকার নির্ধারণ করবে।

সরকারি অনুমোদন পেল ৪৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৮৪৩ পদ

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বৈঠকে সরকারি হওয়া দেশের ৪৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৮৪৩ পদ সরকারিকরণের অনুমোদন পায়। ২১শে আগস্ট সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৩৪ স্কুলের ৭৩৫টি, দুটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৭টি ও পাঁচটি কলেজের জন্য ১০১টি পদ রয়েছে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুবিধা পাবে বাংলাদেশ

চীনের অভ্যন্তরীণ বাজারে বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ পণ্য শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা আরও ১ শতাংশ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীন। এতে বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ পণ্যই কোনোরকম শুল্ক ছাড়া দেশটিতে রপ্তানি করতে পারবে। ৭ই আগস্ট ঢাকায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই সুবিধা চলতি বছরের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

চীন সর্বপ্রথম ২০১০ সালের ১লা জুলাই স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সে দেশের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করে। ওই সুবিধার আওতায় বাংলাদেশসহ ৩৩টি স্বল্পোন্নত দেশ চীনের ৬০ শতাংশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়। পরে ২০২০ সালের ১৬ই জুন শর্তহীনভাবে বাংলাদেশের ৯৭ শতাংশ রপ্তানি পণ্য (৮ হাজার ২৫৬টি পণ্য) দেশটির বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয় চীন– যা ওই বছরের ১লা জুলাই কার্যকর হয়। এরপর ২০২২ সালের শুরুতে বাংলাদেশ আরও ১ শতাংশ পণ্যকে (৩৮৩টি) শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয় দেশটি। সর্বশেষ নতুন করে ৯৮ শতাংশ শুল্কমুক্ত সুবিধাকে আরও ১ শতাংশ বাড়িয়ে দেশটির বাজারে ৯৯ শতাংশ পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধার ঘোষণা দেওয়া হয়। চীনে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য হচ্ছে– ওভেন গার্মেন্টস, নিটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং প্লাস্টিক পণ্য।

পদ্মা সেতুতে ৫৭ দিনে টোল আদায় ১৩৩ কোটি

দেশের সবচেয়ে বড়ো পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের প্রায় দুই মাস গড়ালো। উদ্‌বোধনের পর থেকে ৫৭তম দিন পর্যন্ত এই সেতু দিয়ে পারাপার হয়েছে ১০ লাখের বেশি যানবাহন। আর তাতে টোল আদায় হয়েছে ১৩৩ কোটি টাকারও বেশি। ২২শে আগস্ট পর্যন্ত যানবাহন পারাপার এবং টোল আদায়ের তথ্য জানিয়েছে পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ।

২৫শে জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণবঙ্গের ২১টি জেলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনকারী পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন করেন। এরপর ২৬শে জুন থেকে সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। পদ্মা সেতু দিয়ে যানবাহন পারাপার এবং টোল আদায়কে রেকর্ড মনে করছে সেতু কর্তৃপক্ষ। পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের আগে দেশের সবচেয়ে বড়ো সেতু ছিল যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু।

বঙ্গবন্ধু সেতু চালুর পর প্রথম এক বছরে যে টোল আদায় হয়েছিল, পদ্মা সেতুতে প্রথম মাসেই এর চেয়ে বেশি আয় হয়। উদ্‌বোধনের পর পদ্মা সেতু দিয়ে ৩০ দিনে ছয় লাখের বেশি যানবাহন পারাপার হয়েছিল। এসব যানবাহন থেকে টোল আদায় হয়েছে ৭৬ কোটি টাকার বেশি।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

নারীদের সাইবার দুনিয়ায় সুরক্ষিত রাখতে ডিজিটাল লিটারেসি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, নারীদের সাইবার দুনিয়ায় সুরক্ষিত রাখতে এবং অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সাইবার হাইজিন, অ্যাওয়ারনেস ও ডিজিটাল লিটারেসি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে। ৮ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের উদ্যোগে 'Gender Equality and Future Bangladesh: Voices from Young Generations' শীর্ষক বিশেষ অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট করে ইতোমধ্যেই অনেক নারীর সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে এখন যে কেউ ন্যাশনাল হেল্প লাইন ৩৩৩ কলসেন্টারে ফোন করে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য অথবা সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে কোনো পরামর্শ , সুপারিশ কিংবা আইনের আশ্রয় সহজেই নিতে পারে। তিনি বলেন, কলসেন্টার ৯৯৯ এ ফোন করে বিগত ৫ বছরে ৯ কোটি মানুষ সেবা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ৮ই আগস্ট ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে 'Bangamata: A Paragon of Women's Leadership and Nation-Building in Bangladesh' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এসময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, গ্রামীণ তরুণদের আইসিটিতে সংযুক্ত করতে ২০১০ সালে ইউনিয়ন সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের সময় একজন ছেলের সঙ্গে মেয়ে উদ্যোক্তা নিয়োগের যুগান্তকারী উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এবার বেকার সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছানো ও ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দাম ২০০ টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। এর ফলে বিনোদনের পাশাপাশি শিক্ষা-প্রশিক্ষণ নিয়ে অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করে দেশের সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সার ঘরে বসেই প্রায় ৫০০ মিলিয়নের বেশি এক্সপোর্ট আর্নিং করছে। করোনাতেও আইসিটি বিভাগের লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্পে ৪০ হাজার তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৩০ শতাংশ নারী অংশগ্রহণ করেছে। শিপাওয়ার প্রকল্পে ১৩ হাজার নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে। এবার ২৫০ কোটি টাকার হার প্রকল্পের অধীনে আরও ২৫ হাজার নারী উদ্যোক্তা তৈরি করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ডিজিটাল কনটেন্টে ছোট্ট শিক্ষার্থীরা খেলার ছলে পড়া শিখবে

ডিজিটাল কনটেন্ট পাওয়ার পর ছুটির পরও বাড়ি যেতে চায় না ছোট্ট শিক্ষার্থীরা। আশপাশের স্কুলের অনেক শিক্ষার্থী টিসি নিয়ে এই স্কুলে চলে আসছে। যে সকল স্কুলে মাল্টিমিডিয়া আছে সেগুলোতে ডিজিটাল কনটেন্ট দেওয়ার দাবি উঠেছে। এমনটাই দাবি মানিকগঞ্জের ডিজিটাল ডিভাইস ও ডিজিটাল কনটেন্টে পরিচালিত দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ১১ই আগস্ট মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গুজুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বারাহী পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্টে পাঠদান কর্মসূচি পরিদর্শনকালে ডিজিটাল কনটেন্টে পাঠ প্রদানের সুবিধা তুলে ধরেন। এসময় তিনি বলেন, এ পদ্ধতিতে শিশুরা খেলার ছলে আনন্দের সাথে তাদের এক বছরের সিলেবাস দুই মাসের মধ্যে শেষ করতে সক্ষম হয়। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল শ্রেণি কক্ষে ডিজিটাল কনটেন্টে পাঠদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ হবার পথে। ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রমও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বে বাংলা ভাষায় এ ধরনের ডিজিটাল উপাত্ত তৈরি করা এটাই প্রথম ।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

প্যান্টের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের দাপট

২০২২ সালে বিশ্বে ট্রাউজার বা প্যান্টের বাজার ১১০.২ বিলিয়ন ডলারের। আর এই চাহিদার ১৩.১৬ শতাংশ মিটিয়েছে বাংলাদেশ। ডলারের হিসাবে প্যান্টের বাজারের সাড়ে ১৪ বিলিয়ন ডলারের হিস্যা বাংলাদেশের। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় এক লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা (ডলার ৯৫ টাকা দরে)। এ হিসাব বাজার ও ভোক্তাদের ডাটা পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করা জার্মানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'স্ট্যাটিস্টা'র।

বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করার পথে আমেরিকার মতো ইউরোপেও প্যান্ট রপ্তানিতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে যেমন বাল্ক আইটেমের সস্তা দরের প্যান্ট আছে, তেমনি নিজস্ব ডিজাইনের ফ্যাশনেবল প্রিমিয়াম কোয়ালিটির জিন্সও গিয়েছে বিশ্বের নামিদামি ব্র্যান্ডশপগুলোতে। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বিজিএমইএ থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ৫২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বরাবরের মতো এই রপ্তানির ৪২.৬১ বিলিয়ন ডলারই এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে। আর এই তৈরি পোশাক রপ্তানির মধ্যে ১৪.৫ বিলিয়ন ডলার এসেছে প্যান্ট রপ্তানি থেকে– যা তৈরি পোশাক রপ্তানির ৩৪ শতাংশ এবং দেশের মোট জাতীয় রপ্তানির প্রায় ২৮ শতাংশ। আগের অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে প্যান্ট রপ্তানি হয়েছিল ১০.৬৮ বিলিয়ন ডলার। এক বছরের ব্যবধানে এই খাতে রপ্তানি বেড়েছে ৩.৮২ বিলিয়ন ডলার বা ৩৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। প্রবৃদ্ধির হার ৩৬ শতাংশ। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের মোট ১২৯টি দেশে প্যান্ট রপ্তানি হয়েছে। ৮.৮৯ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করে প্যান্টের পর দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানি পণ্য হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে টি-শার্ট।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে আগ্রহী

ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণে যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহী। প্রাথমিকভাবে ভারতের রাজস্থানের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে যৌথভাবে ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান।

২৮শে আগস্ট বিডার কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, ২৩শে আগস্ট ভারতের রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই) ও ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (আইবিসিসিআই) আয়োজনে অনুষ্ঠিত 'ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) এই সম্মেলনে ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিপুল বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের ফাহমিদা

পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চিত্রশিল্পী ও গল্পকার ফাহমিদা আজিম। সম্প্রতি পুলিৎজারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পুরস্কার প্রাপ্তির এ তথ্য জানানো হয়েছে। ইনসাইডার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হাউ আই এস্কেপড অ্যা চাইনিজ ইন্টারমেন্ট ক্যাম্প (যেভাবে একটি চীনা বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে এসেছি) শিরোনামের প্রতিবেদনে অলংকরণের জন্য তিনি এ পুরস্কার জিতেছেন। এক উইঘুর নারীর চীনা ক্যাম্প থেকে পালানোর গল্প কার্টুনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এটিতে। আর ফাহমিদা এ কার্টুনগুলো এঁকেছেন।

পুলিৎজার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফাহমিদা আজিম সম্পর্কে বলা হয়েছে, ফাহমিদা আজিম একজন চিত্রশিল্পী ও গল্পকার। তাঁর কাজ মূলত মানুষের পরিচয়, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা নিয়ে। ইতোমধ্যে খ্যাতনামা অনেক সংবাদ মাধ্যমে তাঁর শিল্পকর্ম প্রকাশিত হয়েছে। নিজের লেখা *মুসলিম উইমেন আর এভরিথিং*সহ বিভিন্ন বইয়ের ইলাস্ট্রেশন করেছেন ফাহমিদা।

ফাহমিদা আজিম বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে বসবাস করেন। ছয় বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান ফাহমিদা। পড়াশোনা করেছেন কম্যুনিকেশন্স আর্টে। কাজ করছেন এখন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে ওয়াশিংটনের সিয়াটলে একটি কোম্পানিতে।

সাংবাদিকতা ও প্রকাশনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্মানজনক সম্মাননা হিসেবে বিবেচিত হয় এই পুলিৎজার পুরস্কারটি। ১৯১৭ সালে জোসেফ পুলিৎজার পুরস্কারটি প্রবর্তন করেন। প্রতিবছর ২২টি ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

মেট্রোরেল চালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন দুই নারী

দেশের প্রথম মেট্রোরেল চালানোর জন্য যে ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছেন দুজন নারী। একজন মরিয়ম আফিজা অন্যজন আসমা আক্তার। ২রা আগস্ট *প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

মেট্রোরেলের চালকের পদটির নাম 'ট্রেন অপারেটর'। এই পদে ২৫ জনের সঙ্গে নিয়োগ পান মরিয়ম আফিজা। স্টেশন থেকে ট্রেন পরিচালনায় যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সমন্বয় করবেন স্টেশন কন্ট্রোলার। এই পদে ৩৪ জনের সঙ্গে নিয়োগ পেয়েছেন আসমা আক্তার। ট্রেন অপারেটর কখনো কখনো স্টেশন কন্ট্রোলারের দায়িত্ব পালন করবেন, আবার স্টেশন কন্ট্রোলার প্রয়োজন হলে ট্রেন চালাবেন। এ লক্ষ্যেই তাদেরকে নানাবিধ কারিগরি ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

কম দামে পণ্য পাচ্ছে এক কোটি পরিবার

সারা দেশে ভরতুকি মূল্যে পণ্য বিক্রি কার্যক্রম শুরু করেছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। দেশের ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারের মধ্যে এই পণ্য দেওয়া হবে। ২রা আগস্ট রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে টিসিবির পণ্যের বিক্রয় কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশের ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারের মাঝে ভরতুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রির এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। শোকাবহ আগস্টে চিনি, মসুর ডাল, সয়াবিন তেল ও পেঁয়াজ নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি শুরু করা হলো। এসব পণ্য এক কোটি কার্ডহোল্ডারের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ১৭ই আগস্ট ২০২২ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে টিসিবি কর্তৃক এক কোটি পরিবারের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন– পিআইডি

তিনি আরও বলেন, পণ্য বিক্রিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এখন আর ট্রাক সেলে এসব পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে না। নিয়োগকৃত ডিলারদের নির্ধারিত দোকান বা স্থাপনা থেকে দেশব্যাপী এ পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। প্রতি কার্ডধারী এক কেজি চিনি, দুই কেজি মসুর ডাল, দুই লিটার সয়াবিন তেল এবং দুই কেজি পেঁয়াজ কিনতে পারবেন। সিটি করপোরেশন ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে এসব পণ্য বিক্রি অব্যাহত থাকবে। তবে পেঁয়াজ শুধু মহানগরী ও জেলায় টিসিবির আঞ্চলিক কার্যালয় সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোয় বিক্রি করা হবে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী দেশের এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে চিনি প্রতি কেজি ৫৫ টাকা, মসুর ডাল প্রতি কেজি ৬৫ টাকা, সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ১১০ টাকা এবং পেঁয়াজ প্রতি কেজি ২০ টাকা দরে (ভরতুকি মূল্যে) টিসিবির পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ইউরিয়ার পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সরকার ইউরিয়া সারের ব্যবহার হ্রাস ও ডিএপি সারের ব্যবহার বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করে যাচ্ছে। ডিএপি সার মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় ও মানসম্পন্ন ফসল উৎপাদনে কার্যকর এবং পরিবেশবান্ধব। ডিএপি সারে শতকরা ১৮ ভাগ নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সারের উপাদান রয়েছে। সেজন্য ডিএপির ব্যবহার বাড়িয়ে ইউরিয়া সারের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য সরকার ডিএপি সারের মূল্য প্রতি কেজি ৯০ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ টাকা করে কৃষকদের দিয়ে যাচ্ছে। এ উদ্যোগের ফলে বিগত কয়েক বছরে ডিএপি সারের ব্যবহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪ঠা আগস্ট সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সারের দাম বৃদ্ধি, মজুতসহ সার্বিক বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, ফসলের জমিতে সুষম সার প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউরিয়া সারের বর্তমান ব্যবহার কমপক্ষে শতকরা ২০ ভাগ কমিয়ে ইউরিয়ার ব্যবহার যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব। এতে ফসল উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বরং উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে কৃষকের খরচও কমবে। এটি করতে হলে কৃষকসহ সকলের সচেতনতা প্রয়োজন।

কৃষি প্রণোদনার ঋণ পেয়েছেন এক লাখ ৮৯ হাজার কৃষক

করোনায় ক্ষতি মোকাবিলায় কৃষি খাতের জন্য তিন হাজার কোটি টাকার বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এই তহবিল থেকে এখন পর্যন্ত এক লাখ ৮৯ হাজার কৃষক ঋণ পেয়েছেন। এ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ হয়েছে দুই হাজার ৮৩০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ২০শে আগস্ট সংবাদমাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, অসহনীয় মাত্রার শব্দ মানব-স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, তাই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে। তিনি বলেন, এটি সফল করতে সকল ক্ষেত্রে অযথা শব্দ সৃষ্টি করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। এ বিষয়ে নিজে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি অন্যকেও সচেতন করতে হবে। শিশুদেরকে শৈশব থেকেই শব্দ সচেতন করে গড়ে তুলতে পাঠ্যসূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শব্দদূষণ রোধে সরকারের উদ্যোগের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা পেলে দেশের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। ১৭ই আগস্ট ঢাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে অংশীজনের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষার্থী, পরিবহণ চালক/শ্রমিক, কারখানা ও নির্মাণ শ্রমিক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, ইমাম, শিক্ষক, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। টেলিভিশন, বেতার, প্রিন্ট মিডিয়ায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকার ঘোষিত নীরব এলাকা শব্দদূষণ মুক্ত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, সিটি করপোরেশন, বিআরটিএসহ বিভিন্ন সংস্থা একযোগে কাজ করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে শব্দদূষণ বিধিমালা যুগোপযোগী করা হবে। এ বিষয়ে দেশের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ মতো কাজ করা হবে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করলে আইনি ব্যবস্থা

পুনর্নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক, পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। ৭ই আগস্ট ঢাকায় নিজ বাসভবনে ব্রিফিংকালে একথা জানান তিনি। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে ডিজেলচালিত বাস ও মিনিবাসের ভাড়া সমন্বয়ে ৬ই আগস্ট বিআরটিএ-তে সড়ক, পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবং বিআরটিএ-এর চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে পরিবহণ মালিক-শ্রমিক সংগঠনসহ অংশীজনদের বৈঠকে ভাড়া পুনর্নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়।

উল্লেখ্য, সড়ক, পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আন্তঃজেলা ও দূরপাল্লার রুটে চলাচলকারী বাস ও মিনিবাসের ক্ষেত্রে যাত্রী প্রতি কিলোমিটার সর্বোচ্চ ভাড়া ১ দশমিক ৮০ টাকার স্থলে ২ দশমিক ২০ টাকা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলকারী বাসের ক্ষেত্রে ২ দশমিক ১৫ টাকার স্থলে ২ দশমিক ৫০ টাকা ও ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলকারী মিনিবাস এবং ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)-এর আওতাধীন জেলার (নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলা) অভ্যন্তরে চলাচলকারী বাস ও মিনিবাস উভয় ক্ষেত্রে ২ দশমিক ০৫ টাকার স্থলে ২ দশমিক ৪০ টাকা। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলকারী বাসে সর্বনিম্ন ভাড়া ১০ টাকা এবং মিনিবাসের সর্বনিম্ন ভাড়া ৮ টাকা । ভাড়ার হার প্রতিটি বাস ও মিনিবাসের দৃশ্যমান স্থানে আবশ্যিকভাবে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

ঢাকা-গুয়াংজু রুটে বিমানের যাত্রীবাহী ফ্লাইট চালু

ঢাকা-গুয়াংজু রুটে চালু হয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রীবাহী ফ্লাইট। ১৮ই আগস্ট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বহির্গমন টার্মিনালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান, পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী প্রধান অতিথি হিসেবে এ ফ্লাইটের উদ্‌বোধন করেন। ফ্লাইট উদ্‌বোধনকালে

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিমান একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিমানের আর্থিক অবস্থা ভালো। সামনে আরও ভালো অবস্থানে যাবে বলে আশা করছি। বিমানের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত আন্তরিক।

তিনি বলেন, ঢাকা-গুয়াংজু-ঢাকা রুটে ফ্লাইট চালুর ফলে বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীদের চীনে যাতায়াতের সমস্যা দূর হবে। বর্তমানে ফ্লাইটের ফ্রিকোয়েন্সি কম থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে এই ফ্রিকোয়েন্সি আরও বৃদ্ধি পাবে। দুই দেশের মধ্যে ব্যাবসা ও যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি এই রুট বিমানের অন্যতম লাভজনক রুটে পরিণত হবে। যাত্রীগণ বিমানের বিক্রয়কেন্দ্রের পাশাপাশি বিমানের ওয়েবসাইট www.biman-airlines.com ও বিমান অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্সি থেকেও টিকেট ক্রয় করতে পারবেন।

প্রতিবেদনঃ ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেল *মশারি*

আন্তর্জাতিক মহলে একের পর এক পুরস্কার পেয়ে সাড়া ফেলছে নবীন নির্মাতা নুহাশ হুমায়ূন পরিচালিত হরর ঘরানার স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *মশারি*। ২০ ও ২১শে আগস্ট পরপর দুটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এটি পুরস্কৃত হয়। ২০শে আগস্ট উৎসবের সমাপনীর দিনে যুক্তরাষ্ট্রের 'অস্কার কোয়ালিফাইং'খ্যাত চলচ্চিত্র উৎসব 'হলিশর্টস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ সেরা ভৌতিক ছবির পুরস্কার জিতে নুহাশ হুমায়ূনের *মশারি*। ১১ই আগস্ট লস অ্যাঞ্জেলেস বসে এই উৎসব। ২০শে আগস্ট উৎসবের সমাপনী দিনে দেওয়া হয় পুরস্কার। উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন নুহাশ। বিভিন্ন দেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি এই উৎসবে অংশ নেয়। সেখানে *মশারি* সেরা ভৌতিক ছবির পুরস্কার পায়। একইসঙ্গে প্রতিযোগিতা বিভাগে সেরা আটে ছিল *মশারি*। ২১শে আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা শর্ট ফিকশন বিভাগে পুরস্কার পায় *মশারি* চলচ্চিত্রটি ।

জাতীয় কবি নজরুলের ৪৬তম প্রয়াণ দিবস

প্রেম, সাম্য, মানবতা আর বিদ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম প্রয়াণ দিবস ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র, ইংরেজি ২৭শে আগস্ট। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য। বিশ ও ত্রিশের দশকে অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন প্রেম, দ্রোহ, সাম্যবাদ ও জাগরণের কবি। তিনি আমাদের জাতীয় কবি।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। বাবার নাম কাজী ফকির আহমদ, মা জাহেদা খাতুন। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে অসুস্থ কবিকে ভারত থেকে সপরিবার বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। পরে তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কাজী নজরুল ইসলাম ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র (১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন।

জাতীয় কবির প্রয়াণ দিবসে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা, ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও কুমিল্লায় কবির স্মৃতিবিজড়িত স্থানসহ সারা দেশে পালিত হয় দিবসটি। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট রবীন্দ্র সরোবরে আলোচনাসভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবুল মনসুর এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন।

প্রতিবেদনঃ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

২০২২ মেয়েদের এশিয়া কাপ সিলেটে

চার বছর পর মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরছে বাংলাদেশে। মেয়েদের এশিয়া কাপের আসর বসবে সিলেটে। ১ থেকে ১৬ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে সাত দলের এই টুর্নামেন্ট। স্বাগতিক বাংলাদেশ ছাড়া অংশ নেবে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। মেয়েদের এশিয়া কাপে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। শেষবার এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালে। ঐসময় কুয়ালালামপুরে টুর্নামেন্টের ফাইনালে বাংলাদেশ ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছিল।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল ২২শে আগস্ট ২০২২ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় 'বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ' প্রতিযোগিতার মশাল প্রজ্বলন করেন– পিআইডি

এশিয়ান ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপঃ কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ

বাহরাইনে ২১তম এশিয়ান অনূর্ধ্ব-২০ পুরুষ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২-এর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। ২৬শে আগস্ট ক্লাসিফিকেশন রাউন্ডের (১-১২) ম্যাচে শক্তিশালী কাতারকে ২০-২৫, ২৫-১৯, ২৫-১৮, ২৩-২৫ ও ১৫-৯ পয়েন্টে (৩-২ সেটে) হারিয়ে শেষ আট নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের যুবারা জয় পায় ১৫-৯ পয়েন্টের ব্যবধানে। তাতে ৩-২ সেটের জয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়।

ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে দাপুটে জয় পেল বাংলাদেশ 'এ' দল

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'এ' দলকে ৪৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ 'এ' দল। ১৯শে আগস্ট সেন্ট লুসিয়াতে টস হেরে ব্যাটিং করতে নামেন সৌম্য সরকার ও নাঈম শেখ। বাংলাদেশ ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৭৭ রানের সংগ্রহ পায়। ২৭৭ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৩৩ রানেই গুটিয়ে যায় স্বাগতিকরা। ৪৪ রানের সহজ জয় পায় বাংলাদেশ।

প্রতিবেদনঃ মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন কিংবদন্তি গাজী মাজহারুল আনোয়ার

আফরোজা রুমা

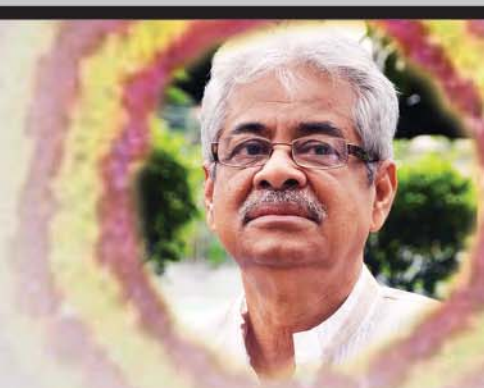

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গীতিকার, কাহিনিকার, চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক গাজী মাজহারুল আনোয়ার চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

গাজী মাজহারুল আনোয়ার ১৯৪৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার দাউদকান্দি থানার তালেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন নামকরা আইনজীবী। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় কুমিল্লা জিলা স্কুলে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র গাজী মাজহারুল আনোয়ারের বাবা চাইতেন ছেলে ডাক্তার হবে। তাই কলেজ শেষে তিনি ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেলে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৩ সালে মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় প্রথম গান লিখেন তিনি। গানটি ছিল 'বুঝেছি মনের বনে রং লেগেছে'– যার সুর করেছিলেন নাজমূল হুদা বাচ্চু ও শিল্পী ছিলেন ফরিদা ইয়াসমিন। এরপর ১৯৬৪ সাল থেকে তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানে গান লেখা শুরু হয় তাঁর। সেই সময়ে গান প্রতি ৫০ টাকা পেতেন যা দিয়েই তাঁর পেশাদার গীতিকার জীবন শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকেই টেলিভিশনের জন্য গান লিখে গেছেন তিনি। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা ২০ হাজারেরও বেশি। তাঁর গানে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ, দেশপ্রেম, প্রকৃতি, জীবনবোধ, প্রেম, বিরহ, স্নেহ, অনুভূতির কথা। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে– গানেরই খাতায় স্বরলিপি লিখে, আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল, শুধু গান গেয়ে পরিচয়, ও পাখি তোর যন্ত্রণা, ইশারায় শীষ দিয়ে, চোখের নজর এমনি কইরা, এই মন তোমাকে দিলাম, আছেন আমার মোক্তার আছেন আমার ব্যারিস্টার প্রভৃতি। এছাড়া বিবিসির জরিপে সর্বকালের সেরা ২০ বাংলা গানের মধ্যে তিনটি গানের রচয়িতা গুণী এই গীতিকবি। গানগুলো হচ্ছে– 'জয় বাংলা, বাংলার জয়', 'একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল' ও 'একবার যেতে দে না'। তাঁর 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটি বিবিসি বাংলার জরিপে ১৩তম স্থান লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রেরণাদায়ক এই গানটি দিয়েই তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যাত্রা শুরু করেন যা সূচনা সংগীত হিসেবে নিয়মিত প্রচার করা হতো।

১৯৬৫ সালে চলচ্চিত্রে যুক্ত হওয়ার পর গাজী মাজহারুল আনোয়ার চিত্রনাট্য, গান, সংলাপ ও কাহিনি রচনা শুরু করেন। তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ৪১টি। প্রথম চলচ্চিত্র *নান্টু ঘটক* ১৯৮২ সালে মুক্তি পায়। অন্যান্য চলচ্চিত্রগুলো হলো– *শান্তি* (১৯৮৪), *স্বাধীন* (১৯৯০), *সমর* (১৯৯০), *শ্রদ্ধা* (১৯৯২), *স্নেহ* (১৯৯৪), *আম্মা* (১৯৯৪), *পরাধীন* (১৯৯৪), *তপস্যা* (১৯৯৪), *উল্কা* (১৯৯৪), *ক্ষুধা* (১৯৯৪), *রাগী* (১৯৯৯), *আর্তনাদ* (১৯৯৯), *জীবনের গল্প* (২০০২), *এই যে দুনিয়া* (২০০৭), *পাষাণের প্রেম* (২০০৭), *হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ* (২০১১) এবং *মেয়েটি এখন কোথায় যাবে* (২০১৬)।

গাজী মাজহারুল আনোয়ার ২০০২ সালে একুশে পদক এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি স্বাধীন দেশের সর্বপ্রথম পুরস্কার বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, একাধিকবার বাচসাস পুরস্কার, বিজেএমই অ্যাওয়ার্ড, ডেইলি স্টার কর্তৃক লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ডসহ তাঁর অর্জিত পুরস্কারের সংখ্যা ১১০টি।

কিংবদন্তি গাজী মাজহারুল আনোয়ারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রখ্যাত এই গীতিকারের মরদেহ ৫ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে নেওয়া হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলির শুরুতেই দেওয়া হয় রাষ্ট্রীয় সম্মাননা গার্ড অব অনার। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনে (বিএফডিসি) তাঁর প্রথম নামাজে জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাঁর মায়ের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 03, September 2022, Tk. 25.00

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২২ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ৭ই মার্চ ১৯৭১ থেকে ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণের পুস্তক 'বজ্রকণ্ঠ'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন –পিআইডি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd